কিছু পলাশের নেশা

ঊষা দেবী সরস্বতী

উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৬৬

প্রকাশক
শ্রীকিরীটিকুমার পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
ব্লক সি, রুম ৩, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীপঞ্চানন দাস
সত্যনারায়ণ প্রেস
২৮/৪এ, বিডন রো
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদচিত্র
শিল্পী অজিত গুপ্ত

পরিকল্পনা
শ্রীসত্যনারায়ণ দে

নিয়ন্ত্রণ
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত

সূচীপত্র

মরনি

আঃ! এক স্বস্তি এক আরাম এক সুখের নিঃশ্বাস ছাড়ল কানু। অনেকদিন পর সে যেন এমন এক আনন্দের খোঁজ পেল। সাউদার হাত কানু জড়িয়ে ধরল তীব্র এক আবেগে —সত্যি! সত্যি বলছেন পাওয়া যাবে? সে যেন বিশ্বাসই করতে পারে না, —আপনার সন্ধানে আছে এমন কেউ?

সাউদা আস্তে করে তার হাত সরিয়ে দিয়েছে। তারপর কানুর পিঠে চাপড় দিয়েছে। বলেছে—আরে ভাই, এতো ভেঙ্গে পড়ার কি আছে? আমার উপর ভরসা রাখ। যখন বলেছি হয়ে যাবে তখন জানবে কিছু একটা হবেই।

সাউদার কথা শেষ করতে দেয় না কানু। বলে—আরে দাদা, এজন্যেই তো সব জায়গায় ফেল করে আপনার কাছে ছুটে আসা। জানি, বাঁচালে সে-ই দাদাই বাঁচাবেন। সাউদা হেসেছেন কথা শুনে—ঠিক আছে ঠিক আছে। এসব নিয়ে এত কথার কি আছে? বরঞ্চ চলো তোমার বৌদি খাবারের কী আয়োজন করেছেন দেখি একবার। কথার মোড় ঘোরান সাউদা। কানুর হাত ধরে টানেন।

ভরসা পেয়ে কানু রান্নাঘর পর্যন্ত চলে এসেছে। —বৌদি। ও বৌদি! ডাক শুনে সাউদার স্ত্রী উঠে এলেন—কি হ'ল ভাই? খুব খিদে পেয়ে গেল? ক'টা গরম গরম বড়া ভাজছি। খেতে ভালই লাগবে। কটা বাকী আছে ভাজা। যাকগে ঠিক আছে, বোসো, কড়াটা নামিয়েই আমি খাবার বেড়ে দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি অনেক কটা কথা একসঙ্গে বলে ফেলেন তিনি।

খেতে খেতে বৌদির সঙ্গে, সাউদার সঙ্গে অনেক কথা হ'ল। নানান হাসিঠাট্টা। সে সব যেন এক আনন্দের স্মৃতি! বৌদি

কত পদ-ই না রান্না করেছিলেন। খেয়ে খুব তৃপ্তি হ'ল। কিন্তু কানু তবুও উস্‌খুস্‌ করছিল। ভয়ে ভয়ে ডাকে—সাউদা! সাউদা বললেন—আরে ভায়া অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বলেইছি তো ভয় নেই ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। ছুটির দিন। খাওয়া হ'ল। এবার একটু গড়িয়ে নিই। তারপরই বের হব আমরা। দেখবে খুব ভাল লাগবে তোমার।

তবুও সাউদার কথা বিশ্বাসই হতে চায়নি কানুর। কেননা সব ঠিক হয়ে যাবে—এই আশ্বাস তো কলকাতার পরিমল, অজয়, পরিতোষ, বৈদ্যবাটির প্রভাস, মানকুণ্ডুর দেবদাস, চন্দননগরের কিশোর, চুঁচুড়ার গোরাচাঁদ, শ্রীরামপুরের বিশুদা, কোন্নগরের সুশোভন, কৃষ্ণনগরের রবি, সমীর, প্রবীর, কল্যাণীর সুভাষ, গাংনাপুরের দীপক, রাণাঘাটের রমেশদা, ডায়মণ্ডহারবারের সুকুমার, ঝাড়গ্রামের পালান, কেশপুরের অমর, আঁইয়া-ধর্মতলার অরুণ বা কালনার ক্ষুদিরাম সব্বাই আগে দিয়েছিল। সবাই, তারা সবাই তো সেই একই কথা বলেছিল।.... ভয় নেই ভয় নেই! সব ঠিক হয়ে যাবে। আরে বাড়িতে টুকটাক কাজ করবে, থাকবে নিজের বাড়ির লোকের মতো—এমন লোক পাওয়া কি আর কঠিন? পেয়ে যাবি, পেয়ে যাবেন। কিন্তু একমাস দু'মাস কেটে যখন বছর ঘুরে গেল তখনও কোনও কাজের লোকই পাওয়া গেল না। ···কি আর করা যাবে? আসলে অতদূর গিয়ে কেউ থাকতে রাজি নয়।....বাড়িতে মায়ের অসুখ করে গেল। নাহলে তো যেতই। বাবাটাই শেষে বেঁকে বসল—না, মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারব না। কৈফিয়তের আর অন্ত নেই।

তাই সাউদা যখন বলেছিল—আরে ভাই চলেই এসো না একদিন। দেখি তোমার জন্য কিছু করা যায় কি-না। গিন্নিকে কিন্তু আনতে ভুলো না। সাউদার কথায় কানুর আনন্দ হয়েছিল খুব। কিন্তু শেষের কথায় আঁতকে উঠে সে—সাউদা! তার

গলা কেমন যেন অসহায় শোনায়। ওকে, ওকে আনব কি করে? মা-কে তাহলে দেখবে কে? ঠিকে মেয়েটা তো রোববার করেই ছুটি নেয়। আমরা বাড়ি থাকি বলে। সাউদার হাতে চাপ দেয় কানু।

কানুর কথা শুনে সাউদাও একটু বিব্রত হন। তাকে একটু গম্ভীর দেখায়। কী যেন ভেবে নেন তিনি। কপালের রেখা কুঁচকে ওঠে। হাত নেড়ে নেড়ে কি সব যেন হিসাব করেন। কানু অবাক হয়ে যায় সে সব দেখে। শেষে সাউদা হেসে ফেলেন। মাথা নাড়েন। আর তুড়ি মেরে বলেন—কোই বাত নঁহী। সব ঠিক হয়ে যাবে। পিঠে চাপড় মারেন কানুর। শোন বলি—কানুর কানে কী সব যেন মতলব বাতলে দেন। কানুর মুখের মেঘ আস্তে আস্তে সরে যায়।

সে ছিল এক স্বস্তি। কিন্তু তারপরও যে সাউদা কানুর জন্য এত আনন্দ এত সুখের সন্ধান দেবেন তাকি আর আগে জানতে পেরেছিল কানু? না, বুঝতে পেরেছিল? নিজেকে প্রশ্ন করতেই বোকা হয়ে যায়।

একটু গড়িয়ে নেবার পর বাসস্ট্যান্ডে এসে একটা মিনিবাসে চেপে বসেছিল কানু সাউদার সঙ্গে।—কোথায় যাচ্ছি? একটা ছোট্ট প্রশ্ন তুলেও কানু চুপ করে যায়। সাউদা তার হাত ধরে বসিয়ে দিয়েছে ততক্ষণ। ভিড় বাড়ছে বাসে। পরে কথা হবে।

অবশ্য বাগনান কানুর অপরিচিত নয়। আগের অফিসের এক বন্ধু মৈদুলের বিয়েতে সে মুসলমানপাড়ায় এসেছিল। তারপর তো কেটে গিয়েছে কত বছর। তাছাড়া বাবার বদলির চাকরিতেও কত জায়গাতেই না ঘুরেছে তারা। আর নিজের চাকরি জীবনেও কম বেড়াল না সে। কিন্তু বাবার হঠাৎ মারা যাওয়া, মা-র অসুখ সব মিলিয়ে কেমন যেন অসহায় করে তুলেছে তাকে। ঘর থেকে আর বের হতেই পারে না তেমন। এখানে সে কতদিন আগে

এসেছিল ? মনে মনে হিসাব করতে থাকে সে। সাত-আট বছর ? আরে হ্যাঁ তাতো হবেই। কিন্তু এখন বাস তো আর সেদিক দিয়ে যাচ্ছে না। তাদের গাড়ি ছুটে চলেছে বোম্বে রোড ধরে। একটা জায়গা আসতেই মিনিবাস ঘুরে যায় সেদিকে। কানু দেখে একটা-বিরাট বোর্ডে লেখা—মানকুর মোড়। মোড় ঘুরতেই দু'পাশে সবুজ ধানের খেত। চোখ জুড়িয়ে যায়। অবশ্য মাঝে দোকানপাট লোকজনের চলাচল সবই আছে। একটা জায়গা আসতে সাউদা চিনিয়ে দেন—এ জায়গাটার নাম বাইনান। খুব শিক্ষিত, সমৃদ্ধশালী ও বর্ধিষ্ণু জায়গা এটা। ব্যাস্, এটুকু বলেই সাউদা চুপ। কানু ভালো করে দেখতে চায়। কিন্তু জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে কানু নজর করে সাউদা কখন চোখ বুজে ফেলেছেন। ওদিকে বাস আস্তে আস্তে খালি হয়ে আসে। বরোদা ব্যাঙ্কের একটা ব্রাঞ্চ দেখা যায়। কণ্ডাকটর হাঁক মারে ···মানকু। মানকু। বাস একটু এগিয়ে যায়। সামনে একটা নদী। সাউদা চোখ খোলেন এবার—এই হল মানকুর ঘাট। আমরা যাব বাকসী। বাকসীর ঘাট। এটুকু বলেই সাউদা আবারও চোখ বোজেন। মানকুর ঘাট থেকে বাস আবার ফিরে আসে ব্যাঙ্কের কাছে। সামনে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে। কানু দেখে মিনিবাস ছাড়া অন্য প্রাইভেট বাসও চলে এ রাস্তায়। দু পাশে ধানের খেত। ফসল ভরা। মাঝে মধ্যে স্কুল দোকানপাট চোখে পড়ে।

দেখতে না দেখতে বাস চলে এল তার শেষ স্টপেজ বাকসী-তে। ওরা নেমে আসে। সাউদা কানুকে টেনে নিয়ে গেল একটা চায়ের দোকানে—ও বীরু মামা কেমন আছ ? তা দু কাপ চা দাও দেখিনি। তার আগে একটু জল খাইয়ো। দোকানদার এগিয়ে এলেন—আরে দাদা যে, এবার তো অনেকদিন পর এলেন এখানে। তা কি মনে করে ? কোথাও যাবেন নাকি ? চা খেতে

খেতে সাউদা গল্প করে চলে—না না তেমন আর যাওয়া হচ্ছে কোথায় ? বলোনা আছে না-কি — ? কানুর মাথায় এসব কিন্তু ঢোকে না। সে-তো অবাক এ জায়গা দেখে। সাউদা এবার তাকে নিয়ে আসেন বাইরে। হাত দিয়ে দেখিয়ে দেন—ঐ যে দেখো কানা দামোদর। তুমি তো বাগনান আসার পথে দামোদর নদীকে দেখেছ। সে-ই দামোদরই এখানে কানা হয়ে গিয়েছে।

—সাউদা একটা কথা বলব ? এবার যেন একটু ভরসা পায় কানু।

—কি ব্যাপার বলো। সস্নেহে বলেন সাউদা।

—শুধু এখানে কেন ? আমি তো রাজরূপপায় দামোদরকে দেখেছি। দেখেছি পতরাতুতে, আবার দেখছি বার্ণপুরেও।

—বেশ বেশ। তা কি মনে হচ্ছে এখানে দামোদরকে দেখে ? সাউদা আগ্রহের সঙ্গে জানতে চান।

—একই দামোদর। কিন্তু এক এক জায়গায় তার এক এক রূপ। কী বিচিত্র! কী অদ্ভুত! কানুর গলায় এক বিস্ময়ের সুর ঝরে পড়ে।

—ঠিক তাই। তুমি ঠিকই বলেছ। সাউদা ঘাড় নাড়েন।

—সাউদা আর একটা কথা বলব ? কানু জানতে চায়। তার চোখ চিক্‌চিক্‌ করে।

—বলো বলো। সাউদা উৎসাহ দেন।

—এই যে অন্য দুটো নদী দেখছি, মিলেছে এখানে, তাদের নাম কি ? কানু হাত তুলে দেখায়।

—ওটা ? ওটা মুণ্ডেশ্বরী। আর ওপারেরটা রূপনারায়ণ. সাউদা কানুকে বুঝিয়ে দেন, দেখিয়ে দেন।

কথা বলতে বলতে তারা এগিয়ে যায় কানা দামোদরের দিকে। ওখানে খেয়া রয়েছে এপার-ওপার করার জন্যে। দুজন এবার উঠে পড়ে তারই একটাতে। সাউদা বলেন—ওপারে রয়েছে

ধান্যঘাড়ি আজানগাছি আর সমসপুর। আমরা যাব ধান্যঘাড়ি। সুকুমারের বাড়ি।

—সুকুমারের বাড়ি? সুকুমার? সে কে সাউদা? কানু অবাক হয়ে জানতে চায়।

—ওহো দ্যাখো দেখি। তোমাকে তো আসল কথাই বলা হয়নি। সাউদা বলেন।

—আসল কথা? কানু হাঁ হয়ে যায় কথা শুনে।

—তবে শোনো— সাউদা এবার বিশদ করেন—আমরা যাব সুকুমারের কাছে। খুব ভাল ছেলে। ভীষণ পরিচিত। এখানে সোশাল ওয়ার্ক করে বেড়ায়। সবাই মানেও ওকে।

আরও কী সব যেন বলে যান সাউদা। কানুর কানে কিছু ঢোকে কিছু ঢোকে না। সে তখন আশেপাশের দুনিয়া দেখতেই ব্যস্ত। তিন-তিনটে নদী তিনটে জেলাকে কেমন বেঁধে রেখেছে। এপাশে হাওড়া, হুগলী জেলা আর ওদিকে মেদিনীপুর জেলা। কানু ভাবতে থাকে। এখানকার লোকও তো নদীকে জয় করে শাসন করেছে। এই নদীর কূলে কূলেই তো বাঙালীর সমাজ ও সভ্যতার অংশ গড়ে উঠেছে। এখানে ছিল আইনের শাসনও। সুতানটি গোবিন্দপুরের মশা, নোংরা জলের এঁদো-পচা জায়গা বাঙালীরা এড়িয়েই গিয়েছে। ওদিকে সাগরপারের বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো সাহেবরা এ দেশের আইন ভেঙ্গেছেন আর শাস্তি এড়াতে পালিয়েছেন। তারপর দেশেরই কিছু কিছু অপরাধীকে আশ্রয় দিয়ে সবাই মিলে গড়ে তুলেছেন নিজেদের পরিত্রাণের জায়গা—কলকাতা শহর! নাগরিক সভ্যতায় নাগরিকদের আজ জয়জয়কার!

কানুর চমক ভাঙ্গে সাউদার কথায়—কানু এদিকে তাকাও। ওই যে দেখতে পাচ্ছ জায়গাটা ওটা পারবাকসী। আর একটু গেলেই পড়বে দুধকামরার হাট।

কানু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে। মন ভরে যায় তার এক অসীম আনন্দে। হায়! ওপরওয়ালা কীভাবে নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন এখানে। শান্তি নির্জনতা সুখ আনন্দ— সবই যেন একাকার হয়ে গিয়েছে। এই আবেগ কানু আর ধরে রাখতে পারে না। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে—সাউদা! এমন জায়গা যে জীবনে দেখতে পাব এতো কখনো ভাবিনি। কোলকাতায় বাড়ি, চাকরিও সেখানে। আমরা সকালে উঠি, বাজার করি, ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দেই অফিস যাই—রাজা উজির মারি, বাড়িও ফিরি লড়াই করতে করতে। তারপর একটু কিছু মুখে দিয়েই ছুটি তাস-দাবার আড্ডায়। এই তো জীবন আমাদের, ছকে বাঁধা! তার বাইরেও যে পা ফেলা যায় কখনও কখনও তাতো ভাবাই যায় না! বেড়াতে যাবার সুযোগ কজনের আসে?

—তাহলেই দেখো। বাঙ্গালী কত জায়গায় চলে যায় বেড়াতে কিন্তু কাছেই যে এত ভাল বেড়াবার জায়গা রয়েছে তা তারা খোঁজই রাখে না। সাউদা আফশোষ করেন।

—সাউদা, ওপাশে তো ডাঙ্গা জমি দেখা যাচ্ছে। ওদিকে কি লোকবসতি রয়েছে? কানু অন্যদিকে সাউদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

—আরে, তোমায় বলতে ভুলেছি ভাই। আসলে বড় ভুলো মন হয়েছে আজকাল আমার। যাক গে শোনো এবার—সাউদা হাত তুলে পরপর দেখিয়ে দেন—ওই দেখো রূপনারায়ণের কোলে রয়েছে ভাটোরা, কুলে-ভাটোরা, চিতনান, ঘোড়ামারা, মীরগ্রাম।

কথা বলতে ওরা তখন চলে এসেছে আজানগাছি। সামনে দেখা গেল মাঝবয়সী একজন কেউ আসছে। হাঁটুর ওপর কাপড়, খালি গা। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। এলোমেলো। হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যেন চলেছে। তাকে দেখে সাউদা দাঁড়িয়ে পড়ে। সামনে

একজনকে ওভাবে দাঁড়াতে দেখে লোকটাও থমকে দাঁড়ায়—কি ব্যাপার? কেরে তুই?

—আরে দীনু কর্ত্তা যে! আমায় যে চিনতেই পারলে না। কিন্তু বলি হনহন করে চললে কোথায়? সাউদা তার হাত ধরে বলে অনেক কথা।

—আরে দাদা ছিঃ ছিঃ! কী কাণ্ড! দেখুন দেখি আপনাকে কী যে সব বললাম। লোকটা জিভ কাটে।—তা এতদিন বাদে মনে পড়ল আমাদের? কি মনে করে? তার চমক কেটেছে ততক্ষণ।

—এই এলাম আর কি? কি আর মনে করে? যাক ভাল কথা—আচ্ছা বলতো সুকুমারকে কোথায় গেলে পাব এখন?

সাউদা সমস্ত ব্যাপারটাকে সহজ করে নিতে চান। কিন্তু দীনু কর্ত্তার তখনও যেন ঘোর কাটেনি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েই রয়েছে।

সাউদা এবার একটু গলা উঁচিয়েই বলেন—আরে বোঝোতো সাত কাজের ঝামেলায় থাকি। আসব বললেই কি আর আসবার সময় পাই? তা বলতে পার সুকুমারকে পাব কোথায়?

দীনু কর্তার এবার যেন হুঁশ আসে। একটু হাসে সে। বলে—দেখ দেখি নিজের তালে থাকতে গিয়ে তোমার কথা কানেই যায়নি, তো কি যেন বললে? ওহো তুমি তো সুকুমারের কথা জানতে চাইলে, তাই না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। একটু তাড়া আছে যে আমার। সাউদা ওর কাছ থেকে খবর নিয়ে সরে পড়তে চাইলেন।

—তা সুকুকে এখন পেয়ে যাবে সমসপুরে। দীনু কর্ত্তাও কথা শেষ করে দাঁড়ান না আর।

কিন্তু কানু একটু দমে যায়। সাউদা আগেই বলেছিল—বুঝলে ভাই কানু, ওই সুকুই হল গিয়ে মুশকিল আসান। ওকে ধরে ফেলতে পারলেই হ'ল। ব্যাস্, আর চিন্তা নেই। কত

লোকের সঙ্গে যোগাযোগ। কত জনের যে কত উপকার করেছে তার কি আর লেখাজোখা আছে? ওর কথা বলতে বলতে সাউদা গদগদ হয়ে ওঠেন।

—তা সেই সুকুমারকে এত দূর এসেও ধরা গেল না? কানু যেন একটু মুষড়েই পড়ে—সাউদা এবার কি হবে? কি করব আমরা? ভয়ে ভয়ে জানতে চায় সে। এক হতাশা এসে ঘিরে ধরে তাকে।

সাউদা কিন্তু হেসেই উড়ান—আরে এত ভয় পেলে কি চলে? মনে ভরসা আনো। তাছাড়া কষ্ট না করলে কেষ্ট পাবে কি করে? সমসপুর কাছেই—চলো চলো।

সাউদার কথা শুনে যেন বাস্তব জগতে ফিরে আসে। এই প্রকৃতি এই পৃথিবী এই আনন্দ নির্মল পরিবেশ থেকে সে যেন চকিতেই ফিরে যায় তাদের কোলকাতায়। তার রাসবিহারীর বাড়ীতে। ভাবতে গিয়েই সে শিউরে ওঠে। ভয় পেয়ে যায়। সাউদার হাত চেপে ধরে—না না সাউদা! চলুন চলুন। এবার তাড়া দেয় কানু।

তারা জোরে জোরে পা চালায়। কিন্তু কপাল! সুকুমারের সঙ্গে দেখা হয়েও কোনও কাজের কাজই হয় না। সুকুমার সব শোনে। তারপর হাত উলটিয়ে তার অক্ষমতার কথা জানায়—না সাউদা এখানে তেমন সুযোগ কোথায়? দেখেছেন তো ধান্যঘড়ি, আজানগাছি, সমসপুর সব জায়গাতেই প্রায় সব মেয়েই কেমন ঘরে ঘরে তাঁত বসিয়ে নিয়েছে। নিজেরাই হাতের কাজ করে দু-চার পয়সা আয় করেছে। তারা মরতে আর ঘর ছেড়ে বাইরে যাবে কেন? সুকুমার পাশ কাটাতে চায় এসব বলে। নানান ধানাইপানাই করে চলে।

কিন্তু এত কথা শুনেও সাউদা পিছু হটে না—আরে ভাই, বুঝলাম তুমি খুব কাজের কাজ করেছ। কিন্তু আমাদের দেশতো

এখনও বিলাত হয়নি। এখানকার গিন্নিরা বিদেশের সব সুযোগ সব সুবিধা চান। অথচ ওদের বলো ··বিদেশের মেয়েদের মতো নিজের হাতে ঘরকন্নার সব কাজ করতে...ব্যাস্ তাহলেই হয়েছে। হুলুস্থুল কাণ্ড। বলবেন—হ্যান দাও ত্যান দাও। অতএব সেটি হবার যো নেই। একটা হেল্পিং হ্যাণ্ড তাদের চাই-ই। পয়সা দিয়ে অন্যের শ্রম কিনে নাও। তাছাড়া দেশের গরীব গুর্বোদের সবাইকেই তো আর তুমি কাজ দিতে পারছ না। তবে তারা যাবে কোথায় ?

সাউদার লম্বাচওড়া লেকচার শুনে সুকুমার গুম হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তাকে একটু চিন্তান্বিত মনে হয়। কী যেন ভেবে নেয় সে। একটু পায়চারিও করে। তারপর কী যেন মনে পড়ে যায় তার—ও হ্যাঁ ঠিক আছে। আপনি একটা কাজ করতে পারেন। দুধকামরার হাটে কালিপদর মেয়ের খোঁজ করুন। ওকে দিয়ে আপনার কাজ চলে যাবে। তবে—সাবধান বাণী শোনায় সে—ওখানে গেলে ভাটার আগেই ফিরবেন।

কথা শেষ করে সুকুমার চলে যায়। সাউদাও আর দাঁড়ায় না। একটা ভটভটি যাচ্ছিল। হাঁকডাক দিয়ে দাঁড় করায় তাকে। কানুকে নিয়ে লাফ দিয়ে ওঠে। —দেখো দেখো কী সুন্দর সীন্ ! কানুর হতাশ ভাব দেখে তাকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করে সাউদা। কিন্তু কানুর কি আর সেদিকে নজর দেবার মতো মন আছে নাকি ? কত আশা নিয়েই না সে এসেছিল। অথচ সে তো এখন গভীর জলে পড়ে গিয়েছে। সারাটা দিন গেল। বাড়িতে গিয়ে কি কৈফিয়ত দেবে ? অন্য জায়গায় খোঁজ করলে হয়তো ভাল ফল হত। কাজ হত কিছু। ভাবে সে।

ওদিকে বাকসীর হাটে পেঁছাতেই সাউদা এক ঝাঁকুনি দেয় কানুকে। চকিতে তার ঘোর কেটে যায়। থতমত খায়। সাউদা আর কিছু বলেন না। ওখানে একটা লঞ্চ দেখে তাতে চেপে বসেন।

পারবাকসী হয়ে দুধকামরার হাট যেতে হবে তাদের। সব তাতেই সাউদার উৎসাহ। কিছুতেই পিছু হটতে চান না।

কিন্তু সব ব্যাপারটাই কেমন যেন বিস্বাদ ঠেকে কানুর কাছে। কি আর হবে অত দূর গিয়ে? কাজের কাজ হচ্ছে কোথায়? আজকের এই আনন্দ এই ঘোরাফেরা এই বেড়ানো সবই কেমন অকারণ মনে হয় তার কাছে। এর থেকে বোধহয় ফিরে যাওয়াই ভাল। যাহোক একটা কিছু বানিয়ে বললেই হবে সুমিকে। সুমি অবশ্য বিশ্বাসই করবে না। মুখঝামটা দেবে। মিথ্যেবাদী বলে তাকে গালমন্দ করবে। মেনেই নিতে হবে সেসব। সব অপবাদ। তাছাড়া আর কি করার আছে? বিয়ের পর সুমিকে কতটা সুখ দিতে পেরেছে সে? কতটা সচ্ছলতা কতটাই বা আনন্দ দিতে পেরেছে? এসব ভাবতে গিয়েই কেমন যেন আনমনা হয়ে যায় কানু। নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মনের সঙ্গে বোঝাপড়া যেন শেষ হয় না তার। কানু দুর্বল হয়ে ওঠে।

—সাউদা! বাধ্য হয়ে কানু ডাকে। তার গলাটা বেশ কাতর শোনায়

—কিরে? কি হল তোর আবার? বোস না চুপ করে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে পারবাকসী। পৌঁছেই গেছি আমরা। কানুর মনের অবস্থাটা বুঝতে পারেন তিনি। বেচারী খুব ঝামেলায় পড়েছে। সাউদা চলে আসেন কানুর কাছে। সস্নেহে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। কানু তাকে কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে যায়। সরে আসে অন্য পাশে। উদাস ভাবে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। আকাশের মেঘ কেমন আনন্দে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। খুব হিংসে হয় ওদের সুখ দেখে।

সাউদা এরই মধ্যে পাশের লোকের সঙ্গে বেশ গল্প জুড়ে দিয়েছেন। কানু কান খাড়া করে। একটু একটু শুনতেও পায়

সেসব কথা—বলো কর্ত্তা, তোমাদের এখানে চাষবাস কেমন হল এবার ? —"তা ভালই হল দাদা। আগেরবারের থেকে একটু বেশিই বলতে পারো। ধারটারগুলো শুধবো এবার। তাছাড়া—", কথা বলতে বলতেই সে একটা বিড়ি বার করে দেয় সাউদাকে। দেশলাই বের করে। নিজেও ধরায় একটা। তারপর আবার গল্প শুরু করে। সাউদা বিড়ি ধরিয়ে সুখটান দেয়। কানু মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তার মন এখন চঞ্চল। ওসব কথা তার এখন ভাল লাগবার নয়। তাছাড়া লঞ্চের একটানা একঘেয়ে আওয়াজ, জল কেটে যাবার শব্দ, অন্য যাত্রীদের টুকটাক কথাবার্ত্তা—সব মিলিয়ে ওদের কথা আর শুনতে পায় না কানু।

এভাবে চলতে চলতে সময় কেটে যায়। এক সময় লঞ্চ এসে ঠেকে অন্য পারে। সাউদার পিছে পিছে কানুও নেমে আসে। আরও ক'জন লোক নেমে এল সেই সঙ্গে। লঞ্চে যার সঙ্গে কথা বলছিল সাউদা সেই আলি সাহেবও নেমে আসেন অন্যদের সঙ্গে। তারা হাঁটা শুরু করেন। দুজনে দুদিকে। হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে সাউদার। তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে ধরেন তাকে—আলি সাহেব, আলি সাহেব। ও আলি সাহেব! শুনবেন একটা কথা ?

ডাক শুনে আলি সাহেব দাঁড়িয়ে পড়েন। ফিরে দেখেন সাউদা হাত নেড়ে নেড়ে আসছেন তার দিকে —কি ব্যাপার ? জানতে চান তিনি।

—আচ্ছা আলি সাহেব, আপনি তো এখানকারই লোক। তা বলতে পারেন কালিপদ, মানে কালি মণ্ডলের বাড়ি কোনটা ? ঠিক খেয়াল পড়ছে না। সাউদার প্রশ্ন।

—কালিপদ ? আলি সাহেব যেন চিন্তা করেন একটু। তারপর কী মনে পড়তে বলেন—ওহো কালিপদ, হ্যাঁ হ্যাঁ কালিপদ, ঠিক মনে পড়েছে আমার। কিন্তু সে তো মারা গেছে অনেককাল। তার সঙ্গে... ? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান আলি সাহেব।

—না, না। কালিপদর সঙ্গে আমার দরকার নেই। সাউদা হেসে পাশ কাটান। আমি ওর বাড়ির খোঁজ করছি। ওর ছেলের সঙ্গে একটু কথা বলব।

—আরে সে কথা তো বলতে হয় আগে। আমি ভাবি কারণ কি? যাকগে সেসব। আলি সাহেবের কোঁচকানো ভুরু সরে যায়। হাসিতে ভরে ওঠে তার মুখ। ঠিক আছে—ওই যে সামনের রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন—হাত তুলে দেখান তিনি—ওই রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে যান, একটা নিমগাছ ডান হাতে পড়বে। ব্যাস্ ঐ নিমগাছের উল্টো দিকের রাস্তা ধরে দু-চার মিনিট গেলেই পড়বে কালিপদর ছেলে বামা মানে বামাপদর ঘর—। আলি সাহেব কথা শেষ করে তার দাড়িতে হাত বোলান।

ওদিকে আলি সাহেবের কথা শুনে কানু ঘাবড়ে যায়। আরে বাবা এত কথা মনে রাখা সম্ভব? নিমগাছ, ডানদিকের রাস্তা! তার মাথা যেন ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে এরই মধ্যে। সাউদা কিন্তু খুব খুশি। দু'হাত তুলে নমস্কার করেন আলি সাহেবকে। মুখে বলেন—আদাব আলি সাহেব! তারপর কানুকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে শুরু করেন বামাপদর ভিটার দিকে।

কানুর এসব আর কিছুই ভাল লাগছে না। কোনও কিছুই তাকে টানতে পারছে না। যে আশা নিয়ে এসেছিল সে তাতো কখন মিলিয়ে গিয়েছে শূন্যে। তাই আশেপাশের প্রকৃতি তার পাখির কলতান কিচির মিচির গুঞ্জন সবই নিরর্থক ঠেকছে তার কাছে। যেতে হয় তাই যাওয়া। নইলে সাউদা আবার কিছু মনে করতে পারেন। তাকে কিছু বলারও উৎসাহ রইল না আর।

সাউদার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকে সে। জড় পুতুলের মতো। সাউদা একসময় দাঁড়িয়ে যান। চোখ তুলে কানু দেখে তারা হাজির হয়েছে আলি সাহেবের বলে দেওয়া বাড়িটার সামনে। টিনের চাল বেড়ার ঘর। উঠোনে দু-একটা সজনে গাছ।

বক ফুলের গাছ দেখা গেল। কলাগাছও রয়েছে দু-চারটে। ক'টা হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে চরে বেড়াচ্ছে সারা উঠোনময়। ওরই মাঝে একটা চার-পাঁচ বছরের ছেলে খালি গায়ে কাদা মাখছে উঠোনে বসে। আর তার থেকে বড় একটা মেয়ে তাকে হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। বলছে—ওঠ ভাই ওঠ! না হলে মা বকবে। উঠে পড়। একটা লজেন্স দেব।

কিন্তু অতটা টানাটানিতেও ছেলেটার ওঠবার কোন ইচ্ছে দেখা গেল না। সে আরও বেশি করে কাদা ছানা শুরু করল। দিদি আর সহ্য করতে পারল না ভায়ের এই বেয়াদপি। গুম গুম করে তার পিঠে কটা কিল কষিয়ে দিয়ে দৌড় লাগাল। কিল খেয়ে ছেলেটা তো মড়া কান্না জুড়ে দিল। ভিতর থেকে এক নারীকণ্ঠ ভেসে এল এবার—কি হল রে হতচ্ছাড়া তোর আবার? হাড়মাস জ্বালিয়ে খেলো। তোর বাপটা জ্বালাল আমাকে তুইও জ্বালা। মরণ মরণ! মরণ হয় না আমার! এ্যাই মুখপুড়ি হতচ্ছাড়ি কি করছিস তুই ওখানে? যা না বাইরে গিয়ে ছেলেটাকে ধর না একটু। ঘরে বসে তো ভাই-র অন্ন গিলছিস কেবল। কাজ কর একটা।

এসব দেখে শুনে কানু তো ভ্যাবাচ্যাকা। সাউদাও বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন বোঝা গেল। ওরা ঘরের দিকে তাকাল। দেখা গেল একটা আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসছে। কিন্তু বাইরে দু'জন অপরিচিত পুরুষ মানুষকে দেখেই সে ঘরের দিকে হুড়মুড় করে ছুট লাগাল—ওমা মাগো। সেই নারীকণ্ঠের ঝঙ্কার মুখ ঝামটা আবারও শোনা গেল—কি হ'লরে আবাগীর বেটি? ঘরে ঢুকলি যে? তোকে না বললাম ছেলেটাকে থামাতে।

—দ্যাখো না বৌ—মেয়েটার গলা শোনা যায়, —বাইরে দু'জন লোক। আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে এখনও।

—বলিস কিরে ? দেখি কোন্ মিন্সে। চল আমার সঙ্গে। বিষ ঝেড়ে দেব।

এসব কথা শুনে কানুর তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার জোগাড়। ভয়ে ভয়ে সাউদার হাত চেপে ধরে। সাউদার মুখে-চোখেও তখন এক অস্বস্তির ভাব। কিন্তু তিনি পোড় খাওয়া লোক। সাহস হারান না। যাহোক দেখা গেল বাইরে বেরিয়ে এসেই সেই মেয়েমানুষটির ভোল যেন পালটে গেছে—ওমা আপনারা ? তা কাকে চাই ? উনি তো বাড়ি নেই। আসবেন অবশ্য এখনই। বসবেন ?

কথা বলার ধরন ধারণ তো বেশ। শুনে মনে হয় যেন শহুরে। অবাক হয় তারা। নিজের জামা কাপড়ের দিকে তাকাল কানু। না, এ তার প্রতারক প্রচ্ছদ নয়। সাউদারও চেহারায় এক সৎ মানুষের ছবিই ফুটে ওঠে। তাই হয়তো বামাপদর বৌ খাতির করল তাদের। তাছাড়া সিনেমা টিনেমা দেখে এটুকু অভিনয় শিখেছে হয়তো। কানু ভাবে।

—বামা, বামাপদর কাছেই দরকার। তোমায় বললে কি হবে ? সাউদা ভনিতা করে না। সরাসরি জানায়।

—আমায় বললে যদি হয়, তেমন যদি মনে করেন, আমায় বলতে পারেন। বেশ টিপে টিপে কথা বলে বামাপদর বৌ। তার কথা শুনে কে বলবে যে এই মুখ দিয়েই গালাগাল বের হচ্ছিল আর একটু আগেই ?

—শুনলাম তোমার ননদ ঘরে বসে বসে খায়, সংসারের কোনও কাজেই লাগে না....। কথা শেষ করতে পারেন না সাউদা। বামার বৌ তড়বড় করে বলে পঠে—না না তেমন কথা নয়। তেমন কথা কে বললে ? মরুক সে হতভাগা। মরনি বড় ভাল মেয়ে। খুব কাজের।

বামাপদর বৌ-র কথা শুনে অবাক হয় কানু। কী ধড়িবাজ— !

ভাবে সে। কেমন এক অস্বস্তিও হতে থাকে তার। এই পরিবেশের মেয়ে তার সংসারে গিয়ে কী করে সব কাজ সামলাবে? বুঝে নেবে সব কিছু? মার সেবা, তাছাড়া গ্যাস, ফ্রীজ—নাঃ, কানু আর কিছু ভাববে না। ভাবতে সাহসও হয় না তার।

—তোমার ননদকে মানে মরনিকে যদি দাও। এই বাবুর বাড়িতে থাকবে। খাওয়া-পরা ছাড়া ভাল টাকা দেবে। অল্পই কাজ। সাউদা এই পরিবেশ দেখে ভয় পাননি। বেমালুম বিজনেস টক্ করে যাচ্ছেন।

—আচ্ছা আচ্ছা। আসুন দাদা, বসুন বসুন। ওরে ও মরনি দু'টো আসন দিয়ে যা-না। বামাপদর বৌ খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠে অতিথিদের আপ্যায়নে।

কানু স্পষ্ট দেখতে পায় বৌ-র চোখে একরাশ লোভ এসে জমা হয়েছে। মরনিকে ভাড়া খাটালে তার ঘরে তার হাতে পয়সা আসবে। অঢেল পয়সা। সেই চিন্তাতেই বামার বৌ মশগুল। মেয়েটা বসে দাদার টাকা ধ্বংস করছে কেবল। সে যদি যে কোনও ভাবে দাদাকে সাহায্য করে তবে ক্ষতি নেই।

এরপরের ঘটনা খুবই সামান্য। যেন ম্যাজিক যেন সিনেমা! কানু অবাক হয়। বামাপদ অবশ্য অনেক তা-না-না-না করে।—না দাদা আমার বোনকে কেন অন্য জায়গায় কাজ করতে পাঠাব? ভাড়া খাটাব? তাছাড়া এত কম টাকায়—? সাউদা যেন ওৎপেতে এই কথাটাই শুনতে চাইছিল। এবার তাকে থামিয়ে দেয়। একটু পাশে টেনে নেয় তাকে। গুজগুজ ফুসফুস করে কী সব যেন কথা হয় তাদের। কানু বুঝতে পারে না। ভেতরে ভেতরে সে তখন দস্তুরমত ঘামছে।

—ঠিক আছে দাদা। আপনি যা ভাল বোঝেন। ঢিপ করে সাউদার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বামাপদ। টাকা দিয়ে সবাইকে কেনা যায়। আর এতো খেতেই পায় না। ভাবে কানু।

সাউদাও হাসেন। কানুকে বলেন—সব ঠিক হয়ে গেল। বুঝলে তো? কানু আগেই বুঝেছিল। তবুও ঘাড় নাড়ে, সে বুঝেছে। মনের ভেতরের এক চাপা অস্বস্তি দূর হল তার! আনন্দে ভরে উঠল তার মুখ। ওঃ, এ রকম শান্তি এ রকম ভাবনা-চিন্তাহীন দিন সে অনেকদিন আগেই হারিয়ে ফেলেছিল। এবার বোধহয় আকাশ বাতাস প্রকৃতি সবই কানুর আনন্দের অংশীদার হবে।

আর মরনি এক কাপড়েই চলে আসে তাদের সঙ্গে।

মরনি এভাবেই চলে আসে কানু-সুমির সংসারে। অজগাঁয়ের এক মেয়েকে শিকড় শুদ্ধ তুলে পুঁতে দেওয়া হল কলকাতার পরিবেশে। পেছনে পড়ে রইল পারবাকসী। তার আকাশ তার বাতাস।

॥ ২ ॥

কানু থেমে যায়। অফিসে বের হবার সময় জামা পরতে গিয়ে দেখে তাতে একটা বোতাম নেই। সুমি বোধহয় টয়লেটে। সেও তো বের হবে। ওকে ডিসটার্ব না করে ডাকে—মরনি, মরনি! অন্য একটা জামা দাও তো।

—যাই দাদা। কথা বলতে বলতেই মরনি অন্য জামা নিয়ে হাজির। জামা খুলতেও সাহায্য করে। কানু জামা পরে বেরিয়ে যায়। ভাবে—ক'মাসেই মেয়েটা কেমন সব সরগর করে নিয়েছে।

—কিরে মরনি? কি হল তোর দাদার আবার? বেরিয়ে এসে জানতে চায় সুমি।—

—কিছু না বৌদি, দাদা জামা বদলালেন তো। সরলভাবে বলে মরনি।

—কেন? আমি যে জামাটা বের করে দিলাম তা-কি পছন্দ হ'ল না তোর দাদার? সুমি বিরক্ত হয়। আর কথা না বলে চলে যায় নিজের কাজে।

এরকম অনেক ছোট-খাটো ঘটনা নিয়ে খুব রাগারাগি করত সুমি। মরনির সামনেই উত্তেজিত হত—ওকে আবার অ আ পড়াতে বসলে যে? আদিখ্যেতা!

—এই একটু লেখাপড়া জানা থাকলে মার ওষুধ টষুধ দেবার সুবিধে হবে। তোমারও একটু রিলিফ দরকার তো। কানু ভয়ে ভয়ে কৈফিয়ৎ দেয়।

কিন্তু অসুস্থ শাশুড়ির সেবা করতে হবে। অফিসে যাওয়া যাবে না...এসব চিন্তা করতে গেলেই সে চটপট মত বদলে ফেলত। —না, না অন্য একটা কাজের লোক ঠিক না করে ওকে ছাড়বে কি করে? তাও কি হয়? তবে শোনো ভাল কথা বলি। ওকে অতো মাথায় তুলো না। শেষে নামাতে পারবে না। তার চেয়ে কাজের মেয়েকে কাজের মেয়ের মতোই থাকতে দাও। বাড়ির মেয়ে করে তুলবে কেন তাকে? সুমি অনেকবার অনুযোগ করেছে। ঝগড়াও হয়েছে তাদের।

কানু অবশ্য ওসব নিয়ে গা করেনি তেমন। আসলে মেয়েটা ভাল। চাহিদাও খুব কম। একটা চুলের ফিতে কিংবা চুল বাঁধার দুটো ক্লিপ ছাড়া তার কাছে আর কিছু চায়ইনি। ফলে এসব কারণেই আশেপাশের কটা বাড়ি থেকে খুব লোভ দেখিয়েছে ওকে। ও বাড়ির মাসির কথা কানুও একদিন শুনে ফেলেছিল—হ্যাঁরে মরনি, বলি কিজন্যে পড়ে আছিস ও বাড়িতে? একটা ঘাটের মড়া আগলাবার জন্য তোকে রেখে চলে যায় ওরা। তার গু-মুত সাফ করা। আরে রাম রাম! একটুও দয়ামায়া—নেই রে তোর উপর! তোরও তো যৌবনের সাধ আহ্লাদ বলে কিছু আছে, না-কি নেই? তোর মতো একটা ভাল মেয়েকে এভাবে ঠকান, কষ্ট দেওয়া? আরে ছিঃ ছিঃ। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা বলে যান তিনি। মরনি কথার জবাব দেয়নি। চুপ করে সরে এসেছে। তৃপ্তি পেয়েছে কানু।

এর ক'দিন বাদেই সুমি মরনিকে ডেকে বলে—যা তো ও বাড়ির মাসিমাকে বারের প্রসাদটা দিয়ে আয়।

কথা শুনে মরনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। শেষে বলে—বৌদি আমায় কিন্তু ওই বাড়ি আর কোনও দিন যেতে বোলো না। ওরা লোক ভাল নয়।

কানুর কানে এসেছে এসব কথাও। কানু বুঝেছে মরনিকে পাবার জন্য বেশি টাকার লোভ দেখাচ্ছে পাড়ারই কেউ কেউ। তাছাড়া কিছু উঠতি ছোকরাও ওকে নিয়ে মজা লুটতে চেয়েছে। মরনি তাকেই এসে বলেছে সেসব কথা। কেঁদেছেও। কানু বলেছে—ঠিক আছে। তোকে আর একা বাড়ির বাইরে যেতে হবে না। সুমি এসব শুনে অবশ্য খুব অসন্তোষ প্রকাশ করেছে… কাজের মেয়ে। সে একদম বাইরে যাবে না বললে চলে? কানু অবশ্য ও কথার জবাব দেয়নি। কি দরকার কথার পিঠে কথা বাড়িয়ে?

এভাবেই চলে সংসার। এভাবেই কাটত ওদের জীবন। মরনিকে এনে অবশ্য অনেক ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে বেঁচেছিল কানু। অফিস থেকে ফিরে আর হাপিত্যেশ করতে হয় না একটু চা জল-খাবারের জন্য। সুমিও স্বস্তি পেয়েছে। কিন্তু তার রকমসকম দেখে সে কথা বোঝা যায় না। কানু ভাবে—সব থেকে সুবিধা হয়েছে মা-র।

…মার অসুখে তারা যতদূর পেরেছে সেবা করেছে। কিন্তু পরপর ক'রাত জেগেই সুমির মেজাজ খারাপ হয়ে যেত—না বাপু! এ আর পারি না আমি। অফিস বাড়ি সামলাব, ছেলেকে দেখব। তার ওপর তোমার অসুস্থ মাকেও সেবা করতে হবে—এ আমি পারব না পারব না। তুমি অন্য কোন ব্যবস্থা কর। সাফ সাফ বলে দেয় সে।

….সুমি প্লিজ, একটু ধৈর্য্য ধর। দেখছ তো একটা কাজের

লোকের জন্য কতজনকে বলেছি। কত ধরাধরি করছি। কানু অসহায় হয়ে বলে।

..থামো। তোমার ওসব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। অনেক ভাঁওতা দিয়েছ। আমার বাড়িতে আমার আত্মীয় বন্ধু আসাতো কবেই শেষ হয়েছে। সুমি কথা শোনায়। মুখ করে।

তার অভিযোগের জবাব দিতে পারত না কানু। কিন্তু এখন মরনিকে পেয়ে তারও ভারি সুবিধা হয়েছে—শুনছ, তোমার ছোট মাসিরা এই রোববার আসবেন! ফোন করেছিলেন অফিসে। তোমার লাইন পায়নি। যাক তা কী কী আনতে হবে বলে দিও। অনেকদিন পর আসছেন তো। ভালমন্দ কিছু খাওয়াতে হবে। কানু ভেবেছে ছেলেটাকে হস্টেল থেকে নিয়ে আসবে। বড় কষ্ট হয় ওর।

এ রকম অনেক কিছু করে সুমিকে তোয়াজ করতে চায়। অবশ্য কানু বোঝে যে মরনি আসাতে সব থেকে লাভ হয়েছে মারই। একজন হোল-টাইমার পেয়ে তার সঙ্গে অনেক সুখ-দুঃখের গল্প করেন তিনি। মরনিও খুব ওস্তাদ হয়েছে। কখন ওষুধ খাওয়াতে হবে, কখন কী কী করতে হবে—সব ঠিক ঠিক জেনে নেয় ডাক্তারবাবুর কাছে। মা-কে দেখা শেষ হলেই আজকাল ডাক্তারবাবু তাকেই ডাকেন—মরনি এদিকে এসো তো। শোনো—প্রথম ওষুধটা খাওয়াবে আট ঘণ্টা পরপর দু'দিন। আর এই ওষুধটা দেবে ছ'ঘণ্টা পরপর। দু'টো ওষুধই চলবে এক সঙ্গে। যদি এর মধ্যে তোমার মার শরীর ঠিক না হয় তবে আমাকে খবর দিও। বুঝেছ? মরনি ঘাড় নাড়ে! —চলি কানুবাবু, কানুকে নমস্কার করে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে যান।

সুমি স্নান সেরে এসেছে এর মধ্যে—কি বললেন ডাক্তারবাবু? ভয় নেই তো? আমার আবার পরশু এক জায়গায় প্রোগ্রাম আছে।

আগে থেকেই ঠিক ছিল। সুমি কৈফিয়ৎ দেয়। কিন্তু সুমি টের পায় না যে সে বাড়ি থেকে সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

এই ভাবেই মরনি বাড়িরই একজন হয়ে উঠেছিল। কানুর সঙ্গে তার কথাও একটু বেশিই হতে থাকে। মার কাছে বেশি সময় থাকার তাগিদে অফিসে ছুটি হলেই কানু চলে আসে বাড়ি। মরনিই তার চা জলখাবার করে দেয়। মাঝে মধ্যে দাদার পাকা চুলও যে বেছে দেয় না এমনও নয়। সুমি একদিন এসব দেখে খুব ক্ষেপে গিয়েছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মরনিকে তাড়াবার কথা সেও ভাবতে পারে না।

এইরকম ছোটখাটো সুখ দুঃখ হাসিঠাট্টা আনন্দ বেদনার মধ্যে দিয়ে ক'টি প্রাণীর জীবন কেটে যায়। মরনিও বোধহয় এক সময় ভুলে যায় তার গাঁয়ের কথা। তাছাড়া ওখানে তার আছেটাই বা কে? মেয়েমানুষের জীবন। আজ এখানে তো কাল সেখানে—বিয়ে হয়ে অন্য পরিবেশে চলে গেলেও তো তাকে মানিয়েই নিতে হয়। মরনি তাই এই বাড়িটাকেই নিজের করে নিয়েছিল। বছরে একবার বামাপদ আসত টাকা নিতে আর বোনকে দু'চারদিনের জন্যে নিয়ে যেতে।

কানুও এ ব্যাপারটা স্বাভাবিক ভেবে মেনে নিয়েছিল। ভাবত সে—হায় জীবন যদি এমনভাবেই কেটে যায়! সে ছাপোষা গেরস্থ খায়-দায় বগল বাজায়। গল্প করবে, আড্ডা দেবে, ঘুরবে, ফিরবে সাহিত্য চর্চা করবে, গান শুনবে—এসব করার সময়ই তার ছিল না। মরনি আসাতে এখন তার সুবিধাই হয়েছে। সে কিছুটা সময় হাতে পেত। তাই মরনি যখন বাড়ি যেত তারই অসুবিধা হত খুব। ওগুলো তো বাদ যেতই, তার ওপর মার দেখভালও করতে হ'ত তাকে। সুমি কিন্তু তার লাইফ স্টাইল বদলায়নি একটুও। নিজেকে নিয়ে ছেলেকে নিয়েই ছিল তার জগৎ তার জীবন। মরনিকে সে কখনই কাজের লোকের বেশি ভাবতে পারেনি। তা নিয়ে অবশ্য মরনির খেদ ছিল না।

॥ ৩ ॥

জীবনটা এ রকমই। সবাই ভাবে জীবন যদি এমন ভাবেই কেটে যায় তবে বেশ হয়। কানুও ভাবত তাই। কিন্তু সুমির সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমনভাবে বদলে যাচ্ছে সে কথা সে কখনই তেমন গভীরভাবে ভেবে দেখেনি। অথচ কানু শুনেছে মেয়েরা যমের কাছে সোয়ামীকে দেবে কিন্তু প্রাণ থাকতেও তাকে সতীনের ঘরে দেবে না। তবে সুমির হ'ল কি? অবশ্য সংসারের খাওয়া-দাওয়া লোক-লৌকিকতা অফিস কাছারী কোন কিছুতেই অসুবিধা হয় না। মরনিই অনেকটা কাজ সামলে দেয় এখন।

কিন্তু সেবার যখন চারদিনের ছুটিতে মরনি দেশে গিয়ে কুড়ি দিনেও ফিরল না তখন কানু খুব চিন্তায় পড়ে গেল। মনে হ'ল জীবনটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। এখন মার শরীর আরও খারাপ হয়েছে। হয়তো মা আর বেশিদিন বাঁচবেনই না। তা এ সময় ছেলে, ছেলের-বৌর একটু সেবাযত্ন করা দরকার। অথচ পরপর ক-রাত জেগে তার কী হালই না হয়েছে। সুমির কিন্তু সেদিকে কোনও নজরই নেই। শাশুড়ির ঘরে একটু উঁকি দিয়েই সে তার দায়িত্ব শেষ করে। কানু তার জীবনের যে অংশটুকু আবার ভরিয়ে নিচ্ছিল মরনি যাবার পর এবার সে জায়গাটা আবারও খালি হওয়া শুরু করল।

তাই ক'দিন থেকেই কানু ভাবছিল একবার মরনির খোঁজে যেতে হয়। সে যদি কাজ ছেড়ে দেয় তবে অন্য লোক খুঁজতে হবে আবার। এর মধ্যে ক'দিন আগে মার ব্লাড, ইউরিন, স্টুল দিয়ে আসতে হয়েছে প্যাথলজিক্যাল টেস্টের জন্য। ধর্মতলায় স্টেটসম্যান হাউসের পাশে এক ল্যাবরেটরিতে। সে সবের রিপোর্টও আনতে হবে এই সপ্তাহেই। ডাক্তারবাবু মাকে দেখতে এসে সেদিন মরনির খোঁজ করেছিলেন। সুমি পাশের ঘরে খোকনকে কাপড়

পরাচ্ছিল। তাই কানুই সব কিছু বুঝে নেয় ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে। কিন্তু সব কিছু ঠিকঠাক মনে রাখতে পারছিল না।

কিন্তু আর নয়—কানু তখন মনে মনে ভীষণ রেগেছে। এভাবে চলতে পারে না। চলা ঠিক উচিৎও নয়। এই শনিবার ছুটির দিনই মরনির খোঁজে যেতে হবে একবার।

ব্যাপারটা আগে থেকেই স্থির করা ছিল কানুর। তাই সেদিন সকালে বাজার নামিয়ে রেখেই বলল—শুনছ, আমার জন্য এবেলা আর রান্না কোর না।

—কেন? কোথায় যাবে? মার অবস্থা—? সুমি যেন ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

—তোমায় পরে বলব। ঘুরে এসে। তুমি বরং আমার জন্যে একটু ভারি জলখাবার আর চা করে দাও। আমি চানটা সেরেনি। তাড়াতাড়ি করে সে।

আর সুমি কিছু বলার আগেই কানু বাথরুমে ঢুকে যায়। তারপর চোখেমুখে কিছু গুঁজে মাকে প্রণাম করে বের হয়ে পড়ে সে। কথা বাড়াবার ইচ্ছে করছিল না তার।

কিন্তু বাগনানে এসে কানু খুব বিব্রত হয়ে পড়ে। সাউদার বাসায় গিয়ে দেখে বাইরে থেকে তালা বন্ধ। পাশের ঘরে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে বৌদির বাপের বাড়ি আমতায় গিয়েছে ওরা। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

ফলে হোটেল থেকে খাওয়ার পাট চুকিয়ে সাউদার পথ ধরে সে চলে আসে বাকসীর হাটে। আজ আবার সেই পুরনো জায়গায় এসে কানু অবাক হয়ে যায়। ক'বছর আগে যেন সে এখানে এসেছিল? ভাবতে গিয়েই মন খারাপ হয়ে যায় তার। হায় কী যে ছিল জীবনে অথচ কী যে হয়ে গেল। মানুষ কীভাবে কোন উন্মাদনায় ছুটে চলে। তারপর যখন দেখে পৃথিবী থেকে চলে যাবার সময় এসেছে তখন সে হাহাকার করে ওঠে। কি করলাম জীবনে?

কেন এলাম এই মানুষের দেহ নিয়ে? সারাদিনের হৈ-হৈ রৈ-রৈ শত্রুতা মিত্রতা বিরোধ সব কিছুর পর মানুষ রাতে ঘুমোতে যাবার আগে কোনও দিন নিজেকে কি প্রশ্ন করেছে—সারাদিন এই যে এত এত কাজ করলাম তার কোনটা যাবে আমার সঙ্গে? কি-ই বা থাকবে আমার? জবাব তো একটাই—কিছু না। হয়তো কিছুই থাকে না মানুষের জীবনে। তাই ছোট ছোট সুখ দুঃখ হানা-হানি মারামারি মানুষ বোধহয় ভুলে থাকতেই ভালবাসে।

হঠাৎ নিজেকেই বলে বসে কানু—দূর বোকা! এসব জ্ঞানের কথা ভেবে তোর লাভ কি? কাজের মেয়ে না পেলে তোর মা-র সেবাযত্ন করবেটা কে শুনি? তার দেখভালটাই বা করবে কে? তোকে তো চাকরীটা রাখতে হবে? নাহলে খাবি কি? বৌয়ের পয়সায়? এ সবের একটাই মানে এবার পরিষ্কার হয়ে আসে কানুর কাছে—মরনি। না না মরনি নয় ওর দাদাটা। কি যেন নাম তার? হ্যাঁ মনে পড়েছে, বামা—বামাপদর কাছে গিয়ে হাত ধরে অনুরোধ করতে হবে মরনিকে ছেড়ে দেবার জন্য। এ ছাড়া পথ নেই। ভাবতে গিয়েই কানু চুপ মেরে যায়—আচ্ছা এমনও তো হতে পারে মরনির বিয়ে দিয়ে দিয়েছে ওর দাদা। দূর দূর! —হেসে ফেলে কানু। যে হাঁস সোনার ডিম দেয় তাকে আবার কোন বোকা মেরে ফেলে? তাছাড়া বোনের বিয়েতে তো টাকা লাগবে। মেয়েটার তো রূপ নেই। এখন ভালমন্দ খেয়ে গায়ে একটু গত্তি লেগেছে। খারাপ লাগে না। কিন্তু টাকা বানানোর এই মেসিনকে হাতছাড়া করবে কেন তার দাদা? সেকি হাঁদা?

কানু যা ভেবেছিল হলও তাই। কানু একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করে। ওর দাদা কেঁদে পড়ে। ভাল অভিনয় জানে। ভাবল কানু। সে কী কান্নার ধুম তার। বৌটাও বোধহয় ট্রেনিং নিয়েছিল। সে কেঁদে পড়ে পা ধরে—না বাবু চলে যাও। মরনি যাবে না। যাবে না। যাবে না। মাথার চুল ছিড়ে

উঠোনে মাথা ঠুকে ঠুকে এক সীন্‌ই করে ফেলে সে। বামা এসে না থামালে বোধহয় এক রক্তারক্তি কাণ্ডই হয়ে যেত—ছিঃ বৌ কাঁদিস না, কাঁদিস না! কথা শোন। ধর ওর বিয়ে হয়ে গেছে। তখনও কি তুই এমন-ই করবি? বামার কথা শুনে বৌ ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। কিন্তু ঘরে গিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না চালাতে থাকে। ছেলে আর মেয়েটা বেশ বড় হয়েছে এখন, অথচ মা-কে কাঁদতে দেখে তারাও মরা কান্না জুড়ে দেয়। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

অথচ মরনিকে দেখতে পায় না কানু। এদের কাণ্ডকারখানা দেখে কিছু বুঝতেও পারে না সে। ফিরে যাবে কী-না ভাবল।

এমন সময় বামা আবার স্টেজে ফিরে এল—বাবু! বলেই কানুর পা জড়িয়ে কাঁদে সে।

—আরে কর কি? কর কি? বলে কানু পিছিয়ে আসে।

—না বাবু। আপনি রাগ করবেন না। বোনটার বিয়ে দিতে পারিনি। লোকে কত কথা বলে। তাই বড় দুঃখ বৌটার। বোঝেনই তো।

—ঠিক আছে। ভাল কথা। কিন্তু এ ক'বছরে কম টাকা তো দিইনি তোমায়। তা' দিয়ে দু-একটা গয়নাটয়না গড়ালে না কেন? কানু ধমক দিতে গিয়েও চুপ করে। বাস্তবে ফিরে আসে।

—ছিঃ ছিঃ বাবু—বামা কানে হাত দেয়—এটা একটা কথা হ'ল? মরনি বলে,....দাদা আমার 'জন্যে কত আর করবি? তার চে' ঘরটা একটু ভাল কর। একটা ভদ্রলোক এলে বসতে দেবার জায়গা নেই। তাই বাবু—। বামাপদ তার কথা শেষ করে না। হাত কচলায় কেবল।

এতক্ষণ ঠিক নজর করেনি। নিজের চিন্তাতেই ব্যস্ত ছিল। ওর কথায় কানু এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখে। সত্যিই ঘরের

একটু ছিরিছাঁদ ফিরেছে। ওর বৌর গায়েও দু'একটা গয়না দেখা গেল যেন!

চকিতেই এখন কানুর মনে পড়ে যায় সাউদাকে। কানু বুঝল কোন দেবতা কোন ফুলে খুশি হন তা তো পণ্ডিতরা আগেই বলেছেন। তাই সে আর কথা না বাড়িয়ে বুদ্ধিমানের মতো বলে—ও এই কথা? আগে বলতে হয়তো এসব। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। সব বুঝেছি। যাও এখন থেকে মাস গেলে মরনি দু'শো টাকা করেই পাবে। তবে হ্যাঁ এ নিয়ে আর গোল কোরনা বাপু।

—বাবু! বামাপদ এসে কানুর হাত চেপে ধরে। ওর চোখে সেই আদিম লোভ আর কামনা দেখতে পায় কানু।

তবে এত সবের পর কানুর আর এক সেকেণ্ডও ওখানে থাকতে ইচ্ছে ঝরছিল না। বেলাও প্রায় পড়ে এসেছে। এবার মরনিকে নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে চায় সে।

—মরনি! কানু ডাক দেয়।

—মরনি! এ্যাই মরনি। বামা হাঁক পাড়ে।

মরনি এবার ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে আসে। ওকে দেখে চমকে ওঠে কানু। বেচারী! একী হাল হয়েছে শরীরের! মরনি ধীর পায়ে এগিয়ে আসে কানুর দিকে। ওর হাত খালি। কিন্তু ব্যাগটা! ব্যাগটা কোথায়? জানতে গিয়েও থেমে যায় কানু। কি হবে এখন আর ওকে এসব কথা বলে?

—মরনি আমি তোমায় নিতে এসেছি! কানু বলে।

—মরনি বাবুর সঙ্গে যা। বামা বলে। মরনি বামার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। তারপর চলতে শুরু করে। কোনও দিকে তাকায় না। কানু কিছু বুঝতে পারে না। বামার থেকে বিদায় নিয়ে সে-ও এবার তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে। মরনিকে ধরতে হবে।

কিছুদূর গিয়েই মরনিকে দেখা যায়। সে হন্‌হন্‌ করে হাঁটছিল।—মরনি, মরনি! কানু ডাক দেয় এবার। মরনি থমকে দাঁড়ায়। পেছন ফেরে। এদিক্‌ ওদিক্‌ তাকায়। কানু ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পায় না। মরনি দৌড়ে আসে। কানুর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে—দাদা আমাকে কেন এতদিন নিতে আসনি? এদের আমি কত বলেছি মার খুব অসুখ। বাড়াবাড়ি। দাদার খুব কষ্ট হবে। এরা শোনেনি। বলে—দরকার হলে টাকার থলে নিয়ে আসবে। সাধবে। দেখিস্‌ তখন মোচড় দিয়ে তোর মাইনে বাড়িয়ে নেব। এখন কোথাও যাবি না। দেখো দাদা—ওরা আমায় ভাল করে খেতেও দেয়নি। কি হাল হয়েছে আমার? কথা শেষ করে মরনি তার কণ্ঠার হাড় দেখায়। কানু চোখ ঘুরিয়ে নেয়। তার চোখে জল আসে। বলে—থাক্‌ ওসব কথা। এখন চলতো আমার সঙ্গে।

মরনি পা বাড়ায়।

॥ ৪ ॥

মানুষের জীবনের চলার পথে কত ঘটনাই না ঘটে। কিন্তু তার সবকিছুর জন্যে মানুষ কি আগে থেকেই প্রস্তুত থাকে? তা তো নয়। কোনও বীজ পোঁতা হলে একদিন তার গাছ হবে ফুল হবে ফল হবে—এসব তো জানা চেনা ঘটনা। লোকে এটাই আশা করে। অথচ এছাড়াও তো কত ঘটনাই না ঘটে যায়। তার কথা কি মানুষ জানতে পারে আগে থেকে? মহাপুরুষরা হয়তো পারেন, তিন-কাল যারা দেখতে পান দিব্যচোখে তাঁরা বোঝেন সেসব কথা।

কিন্তু কানু তো আর কোন মহাপুরুষ নয়। সে একজন সাধারণ লোক। খুবই সাধারণ সে। নিজেকে নিয়ে মাকে নিয়ে বৌ ছেলেকে নিয়ে সে দিন কাটাতে চায়। বড় কিছু ভাববার বা

চিন্তা করবার মতো অবকাশ তার কোথায় ? মরনি না হয়ে যদি অন্য কোনও কাজের মেয়ে থাকত তার বাড়িতে তবে তার জন্যেও সে চিন্তা করত, ভাবনা করত। কেননা সে-ও তার বাড়িরই একজন, সে তার মাকে দেখছে। মা-ই তাকে আগলে আগলে বড় করে তুলেছেন। সেই মাকে সুমি সেবা করবে না, যত্ন করতে চাইবে না এ কথা কানু আগে ভাবতেই পারেনি। এও তো তার জীবনের এক বিরাট ঘটনা।

কিন্তু এইসব বস্তুর কথা আগে কখনও এভাবে ভাবতে পেরেছে কানু ? এই যে মরনি মেয়েটা। এই মেয়েটার জীবনেও তো এবার দাদার কাছে এসে কত ঘটনাই না ঘটে গেল। মা-বাপ মরা মেয়ে। দাদার সংসারে বোঝা হয়েই ছিল। লেখাপড়াও শেখেনি। কানুর কাছে গিয়ে বাঁচল। কিন্তু শুধু খেয়ে পরে থাকাই বাঁচা না-কি ? জীবনের নিজস্ব কী কোনও দাবিই নেই মানুষের কাছে ? সে দাবি কি মেটাতে পারবে মরনি ? কানু বড় ভাবনায় পড়ে যায়। তার নিজের জীবনটাই বা কি ? ক'টা বন্ধু আছে তার ? আছে অফিসের ক'জন আর ক'জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কিন্তু এদের সবার সঙ্গে তেমন করে যোগাযোগ সে আর রাখতে পারে কোথায় ? জীবনের সব চাহিদা কানুও কি মেটাতে পেরেছে ?

—দাদা! মরনির ডাকে ঘোর কাটে কানুর।—দাদা আমরা বাগনান পৌঁছে গেছি। এবার নামতে হবে যে। মরনি উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

—ও হ্যাঁ। দেখেছিস্ ভুলেই গেছি। আসলে কী সব যেন আবোল তাবোল ভাবছিলাম। বলে ঘড়ি দেখে সে। ট্রেন আসতে দেরি অছে। চল আমরা কিছু খেয়েনি। খুব খিদে পেয়েছে। তাছাড়া বাড়ি ফিরতে ফিরতেও রাত হয়ে যাবে।

মরনি আপত্তি করে না। খিদেতো তারও পেয়েছে। তাছাড়া কতদিন তো সে পেট পুরে খেতেও পায়নি। চা না পেয়ে ক'দিন

তার ঘুমই হতে চায়নি। তাই সে বলল—দাদা, মাথা ধরেছে। একটু চা খাব আগে।

—এই যে ভাই এদিকে দুটো চা দেবে। স্টেশনেই এক রেস্তোঁরায় ঢুকে কানু অর্ডার দেয়। —কি খাবে বলো? মরনিকে খাবার পছন্দের সুযোগ দেয়।

যাহোক পথে তেমন আর কোনও কথা হয়নি। বড় ক্লান্ত হয়ে রয়েছে কানু। ট্রেনে বসার জায়গা পেয়ে গা এলিয়ে দেয় সে। মরনিও কথা বলেনি। তবে মা কেমন আছে সে খবরটুকু জেনে নিতে ভোলেনি।

হাওড়া স্টেশনে এসে বাসে চেপে বসে তারা। এবার যেন একটু সুস্থির হয়েছে কানু! বলে—মরনি বুঝলে, মার কতগুলো ডাক্তারি রিপোর্ট আমায় আজই নিয়ে যেতে হবে। কাল সকালেই ডাক্তারবাবুকে দেখাতে হবে সেসব। জানোতো উনি কেমন রাগী। না নিয়ে গেলে খুব বকাঝকা করবেন। আমি ধর্মতলায় একটু নেমেই ওগুলো নিয়ে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু একাই চলে যেও। এ বাসটাতেই তুমি রাসবিহারী চলে যাবে। তাছাড়া তুমিতো বেশ ক'বার আমাদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছ এদিকে। অসুবিধা হবে না। অনেক কথা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে কানু।

মরনি সব শোনে। কী যেন ভাবে। দাদার সঙ্গে নেমে আবার ধাক্কাধাক্কি করে বাসে ওঠা। ছুটির দিনেও ভিড় কম নাকি? ওরে বাব্বাঃ, ভাবতেই তো তার প্রাণ বের হবার জোগাড়! না বাবা তাতে কাজ নেই। সেও তো ক্লান্ত। তাই মুখ ফুটে সে বলে —দাদা আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করুন। আমি আর কি বলব?

—না না, তোমার অসুবিধা হবে না। আমি কণ্ডাকটরকে বলে দিচ্ছি। আমাদের স্টপ এলেই তোমায় নামিয়ে দেবে। এই নাও পাঁচ টাকা। রাখ তোমার কাছে।

—ঠিক আছে। ঘাড় নাড়ে মরনি। আপনি কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবেন। সেই কোন্ সকালে বের হয়েছেন। তারপর এই ছোটাছুটি।

—আচ্ছা আচ্ছা। সে হবে'খন।

কানু অবাক হয়ে যায় মরনির কথা শুনে। একটু স্নেহ একটু ভালবাসা পেলে মেয়েরা অকাতরে বিলিয়ে দিতে পারে নিজেদের। ভাবে কানু। কণ্ডাকটরকে বলে মরনিকে দেখিয়ে দেয়। ব্যাস্ এবার নিশ্চিন্ত। ধর্মতলা আসতে নেমে যায় কানু।

কিন্তু পথের দেবতা যে এমন খেলাও খেলতে জানেন তার কোনও আগাম জানান তিনি দেন না। অথচ কেন তিনি দিলেন না, অন্ততঃ কানু বা মরনিকে? বেচারী! আসলে মানুষকে নিয়ে এমন মজার মজার খেলায় মানুষকে বোকা বানিয়ে তাকে কাঁদিয়ে পথের দেবতা বোধ হয় খুব আনন্দ পান। তা'হলে কানুর বাড়ি ফিরতে অত দেরি হবে কেন? ক্লিনিক ছুটির পরও রিপোর্ট পেতে তার যে অকারণ অতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে সেকথা কি তার জানা ছিল?

আসলে বাড়ি ফিরে সুমিকে এসব কথাই বোঝাতে চাইল সে—প্লীজ সুমি। ব্যাপারটা বোঝো। তাছাড়া বাস ট্রামের অবস্থা—

—ওসব বাজে কথা ছাড়ো। সেই সাতসকালে বের হয়ে আড্ডা মেরে মজা লুটে—ঘরে ফিরে এখন গপ্পো বানান হচ্ছে। কেন মেট্রোতে আসলে কি অসুবিধা ছিল? আমি যে কি করে কাটালাম সারাটা দিন? সুমি রাগে ফেটে পড়ে। চোখে জল নেই; রয়েছে এক আহত রমণীর ক্ষোভ বেদনা।

কিন্তু কানু থরথর করে কাঁপতে থাকে। বোধহয় পড়েই যাবে। কোনও ক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ার টেনে বসে পড়ে সে। মরনি! মরনি বাড়ি আসেনি? কোথায় গেল মেয়েটা তবে? কানু এবার ঘামতে থাকে। উঠে গিয়ে ফ্যানটা বাড়িয়ে

দেয়। ভাবে বলে—আমায় একটু চা দেবে? গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বলতে গিয়েও থেমে যায়। সুমিকে সে চেনে। ক'টা আজেবাজে কথা বলে দেবে—যেখানে আড্ডা দিচ্ছিলে সেখানে এক কাপ চাও জুটল না!

কানু চুপ করে যায়। ভাবে কিছুক্ষণ। ভাবে, মরনি বোধ হয় এসে মা-র কাছে বসে গল্প করছে এখন। কানু তাড়াতাড়ি মার ঘরে যায়। কিন্তু মরনি সেখানেও নেই।

এবার বাথরুমে গিয়ে চট্‌পট চোখে মুখে জল দেয় কানু। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। ভাবতে গিয়ে মাথা গরম হয়ে যায় তার। পুলিশে ডায়রী করবে? তাদের যা কাণ্ড! সব শুনে হয়তো তাকেই দুষবে—আপনিই ওকে কোথাও লুকিয়েছেন। এখন ডায়রী করতে এসেছেন হারিয়ে গিয়েছে বলে। ন্যাকা! ভালমানুষি! সাধু সাজা! ওর মা নেই বাবা নেই—ব্যাস্ ব্যাস্ কেউ ঝামেলা করবে না। বলুন কত টাকায় পাচার করেছেন মেয়েটাকে?....ধমক খেয়ে কানুর কান ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। পুলিশ গলা নামায়....যান্ যান্ এ নিয়ে কথা বাড়াবেন না। কিছু মালকড়ি দিয়ে কেটে পড়ুন এখান থেকে...

কানু পালিয়ে আসে। ঘুমের মধ্যেও এসব ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভয় পায় কানু। কার কাছে যাবে সে এখন?

....তুমি। হ্যাঁ তুমিই লুকিয়েছ ওকে। ভেবেছ আমার চোখকে ফাঁকি দেবে? অনেকদিন থেকেই দেখছি তোমাদের পীরিত খুব জমে উঠেছে। নতুন ছুকরী পেয়ে আমাকে আর মনে ধরছে না। এখনই মরনিকে বিদায় কর। দরকার নেই ওর কাজের। দূর করে দাও ওকে। ও হতচ্ছাড়ি আমার সংসার ছারখার করে দিতে এসেছে। ওকে আমি ছাড়ব না। সুমি হিংস্র হয়ে উঠেছে। দেয়ালে মাথা ঠুকে কাঁদতে কাঁদতে বলেছে এসব কথা। আর

খোকন আচমকা ঘুম ভেঙ্গে বিছানার ওপর উঠে বসেছে। অবাক হয়ে দেখছে—শুনছে সবকিছু।

ভাবতে গিয়েই কানু গুম হয়ে যায়। এসব দৃশ্য কল্পনা করতেও বুক কাঁপে তার। মনে মনে ঠিক করে এদের কারো কাছেই সে কিছু ফাঁস করবে না এখন।

—এসো খেতে এসো। সুমির ডাক এল। আমরা খেয়ে নিয়েছি। তুমি এবার অনুগ্রহ করে খেয়ে নিয়ে উদ্ধার করো আমাকে। সুমির কথা কেমন যেন কর্কশ শোনায়। কানু কোনও জবাব দেয় না। চুপচাপ টেবিলে এসে বসে পড়ে।

—আচ্ছা তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি? সুমি কাছে আসে।

—বলো। কি বলবে বলো? কানু সাবধানে জবাব দেয়।

—তুমি যে সেদিন যাবার সময় বলে গেলে মরনিকে আনতে যাচ্ছ তার কি হ'ল?

—মরনি? কানু আকাশ থেকে পড়ে যেন। ওহো না, না মানে মরনি, না না অন্য একটা কাজে আট্‌কা পড়ে ওখানে আর যাওয়া হ'ল কোথায়? কানু প্রসঙ্গটা কাটাতে চায় প্রাণপণে।

—ভালো ভালো। তা এরকম করে আমাকে কষ্ট না দিয়ে অন্য লোক খুঁজলেই তো হয়। তার কিছু করছ? সুমি জানতে চায়।

—অন্য লোক? মরনি? ওহো! ঠিক বলেছ ঠিকই বলেছ। সাউদার সঙ্গেও যোগাযোগ নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখি কাল থেকেই খোঁজ করব অন্য লোকের। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে সে।

কিন্তু বিছানায় শুয়েও কানু দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না। মেয়েটা গেল কোথায়? গাড়িচাপা চুরি খুন ধর্ষণ—খবরের কাগজের লাইনগুলো যেন তাকে ঘিরে নাচ শুরু করে দিয়েছে

তখন। বামা আসবে এক বছর বাদে টাকা নিতে। কিন্তু তার আগেই যদি কেউ তার কাছে বোনের খবরটা পৌঁছে দেয়? বামাপদ তো জানে মরনি কানুর সঙ্গেই এসেছে। কানু কি বলবে—না, না মিথ্যা কথা! মরনি আমার সঙ্গে আসেনি। প্রমাণ নেই। কোন প্রমাণই নেই।

ভাবতে ভাবতে উত্তেজনায় বিছানায় উঠে বসেছে কানু। মরনি। বড় ভাল সুন্দর লক্ষ্মী মেয়ে মরনি। তার জন্যে আজ মিথ্যা কথা বলতে হবে নাকি কানুকে? কিন্তু এমন কথাতো ছিল না। কানু অধীর হয়ে ওঠে।

এরকম সাত-পাঁচ নানান কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমের কোন্ এক অজানা রহস্যপুরীতে হারিয়ে যায় কানু। পাশের ঘরে তার অসুস্থ মা, বাঁ পাশের বিছানায় শোওয়া তার বৌ সুমি অথবা ছেলে খোকন কেউ জানতেই পারেনা দিনের পর দিন কানুর সারাদিনের এই গোপন লড়াই-এর কথা।

সব ঝড় ঝাপটা কানুকেই নিজের বুক পেতে নিতে হচ্ছে সংগোপনে। মরনি জানতেই পারে না তারই জন্যে তার দাদার কি অবস্থা হয়েছে আজ!

॥ ৫ ॥

—কানুবাবু। পরিচিত কেউ ডাকেন।

—কানুদা! ছোটদের কেউ ডাকে।

—অ্যাই কানু! কোনও বন্ধু আওয়াজ দেয়।

—শুনছ? এদিকে এসোনা একটু। সুমি অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে।

—কানু আমার কাছে বোসনা একটু। দুটো কথা বলি। সারাদিন কি যে ছটফট্ করিস ? মা বলেন।

—বাপী আমার স্কেচ্ পেনসিল কিন্তু আজই চাই। খোকন আবদার করে।

কিন্তু নানাজনের এসব নানা কথার ভিড়ে কানু আবারও অস্থির হয়ে ওঠে।

—কি হ'ল কানুবাবু ? কথার জবাব দিচ্ছেন না যে ? চুপ করে রইলেন কেন ?

—কি হ'ল আপনার আবার ? এত অন্যমনস্ক হলে অফিসের কাজ চলে কি করে ? বড়সাহেব সেদিন খুব রেগেগেছেন।

—কানুদা হবে নাকি এক হাত আজ ? ভাল পার্টনার আছে। কলিগদের কেউবা বলে।

—কানুদা চলুননা ওর পেছনে লাগা যাক্ একটু। অনেকদিন ওকে নিয়ে রগড় করা হয়নি। ছেলে-ছোকরাদের কেউবা বলে।

—অ্যাই কানু ! আরে শোনই না এদিকে। কি হ'ল মুখ ভার কেন ? আনমনা কেন সখা ? সুমির সঙ্গে কি ঝগড়া করে এলি নাকি ? ভালবাসার বিয়ে তেতো এমন তো হবার কথা নয় ভাই।

—যাক্ কেমন আছিস তোরা ? কতদিন দেখা নেই। মাসিমা কেমন আছেন এখন ? বাচ্চা কত বড় হল, কোন ক্লাশে পড়ে ? কোনও পুরনো প্রিয়জন বলে।

—শুনছ ? তুমি কিন্তু বড় ভুলে যাচ্ছ সবকিছু আজকাল। বাজারের ফর্দ দেখে জিনিস আনতেও ভুল ? রান্নাঘর থেকে গজগজ করে সুমি।

কানু কিন্তু এসব কোনও কথারই জবাব দিতে পারে না। এখন সবকিছুই কেমন যেন বিস্বাদ লাগে তার। কোন্ এক অজানা ভীতি তাকে কেমন যেন অসহায় করে তুলেছে। অথচ সে

নিরপরাধ কিন্তু কে বিশ্বাস করবে তার কথা? আর মরনি? সে-ও কি কোনদিন তাকে মাফ করবে? সে-কি বেঁচে আছে? তবে কেন সে আসছে না? এখানে কি তার কোনও অসুবিধা হচ্ছিল? কাকে এসব বলবে কানু। সুমি এমন কি আর ক্যাট্‌ক্যাট্‌ করত? প্রতিদিন কত কথাই-না বলা হয় সারা পৃথিবী জুড়ে। কিন্তু সব কথা কি সবার শোনার জন্যে বলা হয়? নাকি সবাই সব কথা শুনতে পারে? তবে প্রতিদিন এত কথা বলা হয় কেন? না বললে কারই বা এমনকি ক্ষতি হতে পারে?

আকাশপাতাল চিন্তা করে যায় কানু। ভাবতে বসে। কিন্তু কিছুতেই কোনও কিছুর তল সে যেন খুঁজে পায় না।

—এই যে কানুবাবু! কেমন আছেন? অনেকদিন যে দেখি না আপনাকে।

....কই না তো? আমি তো ভালই আছি। পাড়াতেই আছি। নতুন ভাড়াটের কথার জবাবে একটা কিছু উত্তর দিয়ে সরে পড়ে কানু। অথচ সবাইকে পাশ কাটান কি সম্ভব?

—না কানু। আমার কথা শোনো! নিজের চেহারাটা আয়নায় দেখো একবার। অতরঙ্গজন বলে।

....আরে না, না। আমিতো ভালই আছি। কি যে বলো তোমরা? ম্লান মুখটাকে হাসিতে ভরাতে চায় কানু।

—যাও বাজে কথা ছাড়ো। ধমক দেয় বন্ধু সুনীল।

—না ভাই, বিশ্বাস করো আমার কথা। সুনীলের দুহাত চেপে ধরে কানু। বিশ্বাস করো আমার কিছু হয়নি। মার শরীর তো খারাপ। জানোই তো রাত টাত জাগতে হয়। কানুর কৈফিয়ৎ কেমন যেন জলো শোনায়।

—দেখ ভাই। থাক ও কথা। মাসিমার কথা আমি জানি। আর আজই সেজন্যে প্রথম রাত জাগছ না তুমি। সুনীল বন্ধুকে

হাত ধরে টেনে বসায় পাশে। পরম স্নেহে পরম বন্ধুত্বের উষ্ণতায় পিঠে হাত রাখে কানুর।

এবার কানু আর কোনও জবাব দিতে পারে না। সুনীলকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে। খালি ক্যাণ্টিনে তখন লোকজন নেই বললেই চলে।

—আরে কানু কি হ'ল তোমার? সুনীল প্রথমে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও তাড়াতাড়ি সামলে নেয় নিজেকে। চলো ওপাশে বসে শুনি তোমার কথা। নির্জন ক্যাণ্টিনের এক কোণায় টেনে নিয়ে যায় কানুকে। দু'টো চা নিয়ে বসে। সিগারেট ধরায়।

কানু চুপচাপ বসে থাকে। কী যে সে বলবে কী যে সে বলতে পারে ভেবেই পায় না। সুনীল তার সেই অবস্থা দেখে বলে —কানু আমার মনে হয় কোনও একজন ভাল লোকের কাছে তোমার হাত দেখান দরকার। জানো তো আমার এতে খুব বিশ্বাস। তুমিতো আমাদের বাড়ি আসনি কখনও। একদিন তোমায় নিয়ে যাব। কাছেই থাকেন ভদ্রলোক।

তারপর সুনীল ক'দিন তাগাদা দিয়েও কানুর থেকে কোনও সাড়াই পেল না। কানু ধানাই পানাই করে এড়িয়ে গিয়েছে। আর সে যত পিছিয়ে গিয়েছে সুনীলের জেদ যেন ততই বেড়ে গিয়েছে। তাকে জোর করে চেপে ধরতে চেয়েছে। বোধ হয় জগতের এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

তা সেদিন অফিস কি কারণে যেন দু'টোয় ছুটি হয়ে গেল। সুনীল চলে এল কানুর কাছে। —কানু! ডাকল সে—আজ তোমায় ছাড়ছি না। যেতেই হবে আমার সঙ্গে। বলেই সুনীল তার হাত চেপে ধরে।

কানু অসহায় হয়ে পড়ে। তারপর হাল ছেড়ে দেয়। যাক্ সুনীল নিয়ে যাক তাকে যেখানে খুশি। এই অফিসে ওর সঙ্গেই

তার খাতির মেলামেশা একটু বেশি। ওর সঙ্গেই যাহোক্ দু-চারটে তার মনের কথা।

সুনীলের সঙ্গে শেয়ালদা স্টেশনে এসে ট্রেন ধরল কানু। যেতে হবে বারুইপুর। সুনীলের বাড়ি। ট্রেন জার্নি অবশ্য খারাপ লাগে না কানুর—আরে এদিকে এতো বাড়ি-ঘর হয়েছে? অবাক হয়ে যায় সে।

—হ্যাঁ। তোমরা তো কেবল অফিস-বাড়ি আর বাড়ি-অফিস করো। ছুটি পেলেই ছোটো কলকাতার বাইরে অনেক দূরে কোথাও। কিন্তু আশেপাশে যে কত বদল হয়েছে সে খবর কেউ রাখে না।

—সত্যিই সুনীল! আমরা কিছুই টের পাই না। খবরের কাগজে অবশ্য বিজ্ঞাপন থাকে সস্তায় জমি—সস্তায় জমি বাড়ি। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার হয়নি আমার। কানু স্পষ্ট স্বীকার করে।

—সত্যিই কানু। তোমার চোখ থাকলে দেখতে কোলকাতা থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালী কেমন পালাচ্ছে। দেখো চাষের জমিতে কেমন বাড়ি উঠছে। ফসলের থেকে চাষের জমি বিক্রি করে হয়তো লাভ বেশি হয় এখন।

—তা এদিকে জমির দাম কত? কানু জানতে চায়।

—বললে বিশ্বাস করবে?

—আরে বলই না তুমি। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলে কানু।

—এক কাঠার দামই ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকা।

—আরে বল কি? হাঁ হয়ে যায় কানুর মুখ।

—ব্যাস্। এবার আমাদের নামতে হবে। সুনীল ডাকে। দেখলে তো কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম কেমন।

বারুইপুর স্টেশন থেকে বের হয়ে সিনেমা হল পেরিয়ে চলে আসে ওরা।

সুনীল এবার একটা রিক্সা ডাকে—শিবানীপীঠ কালীবাড়ি যাব। তারপর কানুকে বলে—কাছেই ভদ্রলোক থাকেন। খুব ভাল হাত দেখেন। তার আগে পুজো দিয়ে নেব কালীবাড়ীতে। ওখানে তুমি যা মানত করবে তা ফলবেই।

—সত্যি? কানু যেন ভরসা পায় সুনীলের কথায়। কিন্তু অনুযোগ করে—এসব কথা আগে কেন জানাওনি আমাকে?

—যাকগে যাকগে। আজ দিন ভাল আছে। ওকে পেয়ে যাব। চলো আমরা এসে গিয়েছি।

সুনীল রিক্সা ভাড়া মিটিয়ে দেয়। সামনের মিষ্টির দোকান থেকে পুজোর মিষ্টি কেনে। কানুও কিনে নেয়।

এ জায়গায় কানু আগে কোনদিনই আসেনি। শোনেওনি এর কথা। কিন্তু ভক্তদের ভিড় দেখে সে অবাক হয়ে যায়। সবাই খুব ভক্তিভরে পুজো দিচ্ছিলেন। সুনীলের সঙ্গে কানুও পুজো দেয়। খুব ভাল লাগে তার। পুজোর পাট চুকলে সুনীল তাকে নিয়ে যায় জ্যোতিষীর বাড়ি। তিনি সুনীলকে ঘরের বাইরে বসতে বলেন। কানুকে কাছে ডেকে নেন। কানু তাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে। বলে—আমি খুব দুঃখী। আমি খুব অসহায়। আমাকে দয়া করুন।

—আরে আমি জানি। ঠাকুরমশাই তার হাত দেখতে দেখতে বলেন।

—বাবা, আমার সব ঝামেলা মিটে যাবে তো? কানু আকুল হয়ে জানতে চায়।

—মিটবে মিটবে। তোর সব অশান্তিই মিটে যাবে। হ্যাঁ—খুব ভাল করে হাতের রেখা পরীক্ষা করেন তিনি—খুব তাড়াতাড়িই তোর মন শান্ত হয়ে যাবে।

কথা শুনে কানু গড় হয়ে প্রণাম করে তাঁকে। তিনি আশীর্ব্বাদ করেন।

অসীম আনন্দে মন ভরে ওঠে কানুর। কী যে এক ঝামেলা এক অশান্তি তার মাথায় চেপে বসেছে! মরনি! মরনি হারিয়ে যাবার পর থেকেই তো তার এই হাল হয়েছে। ঠিকমতো খায় না শোয় না—লোকের সঙ্গে মেলামেশা যাও বা আবার শুরু করেছিল তাও এখন বন্ধ। পুলিশ দেখলেই আঁতকে ওঠে—এই ধরতে এলো বুঝি। তাছাড়া এদিকে বছর ঘুরে এলো। ওর দাদা টাকা নিতে এল বলে। বোনকে দেখে যাবে। উঃ—ভাবতে ভাবতে সে এতদিন প্রায় পাগল হতে চলেছিল। আজ ঠাকুরমশাই আশ্বাসভরা আশীর্বাদ দিয়ে বাঁচালেন তাকে।

ঘর থেকে বের হয়ে আসে সে। সুনীল দাঁড়িয়েছিল। কানু তাকে জড়িয়ে ধরে—ভাই কী যে উপকার করলে আজ আমার। হাত পা নেড়ে নেড়ে বলে চলে সে।

সুনীল হাতঘড়িতে সময় দেখে। বলে—ব্যাস্ ব্যাস্ এই তো বেশ ভাল ছেলের মতো কথা। হাতে একটু সময় আছে। কাছেই বারুইপুর পুরাতন বাজারে আমার বাড়ি। চলো সেখান থেকে একটু চা-টা খেয়ে আসবে। বাড়িতে তোমার কথা এতো বলি। আজ তোমায় দেখলে সবাই খুব খুশি হবে। ভয় নেই, তুমি ঠিক সময়েই বাড়ি পেঁছতে পারবে।

—বেশি দেরি করবো না কিন্তু। কানু বলে।

তারও আপত্তি নেই। আসলে তার মনটা এখন বেশ হালকা ঝরঝরে হয়ে রয়েছে। সুনীলের কৃপাতেই এই আসা এই পুজো দেওয়া এই হাত দেখানো এই মানসিক শান্তি—তাকে সে না করে কি করে? কানু ভাবে। একটা রিক্সা ডেকে উঠে পড়ে তারা দুজনে।

ওখান থেকে সুনীলদের বাড়ি বেশ দূর। কানু অবাক হয়—তুমি প্রতিদিন এত দূর থেকে যাতায়াত করো?

—কি আর করা বলো ? তবে আমাদের বাড়ি থেকে স্টেশন খুব দূরে নয়। হেঁটে গেলে তিন চার মিনিট লাগে।

—যাঃ। তোমাদের কাছে দশ মাইলও কিছুই নয়। কানু হেসে বলে।

—ব্যাপারটা তা নয়। স্টেশনে আমাদের সাইকেল রাখারও ব্যবস্থা আছে। সে বোঝায়।

—ওহো তাই বলো। কানু ঘাড় নাড়ে। যেন কত বুঝেছে।

সুনীলের বাড়ি কিন্তু বেশ ছড়ানো। উঠোন আছে। তুলসীতলাও রয়েছে। বাড়িতে সুনীলের বুড়ি মা, ছেলে মেয়ে বৌ, এক বেকার ভাইও রয়েছে। কিন্তু বাড়িতে পা দিলেই মনে হয় ওর বাড়িতে সুখ আছে শান্তি আছে। তবে পাড়াটা বড় নির্জন। বড় রাস্তায় বাস চলে। সোজা যায় ধর্মতলা। ধর্মতলা যাবার পথে বাঁদিকের রাস্তা ধরে অনেকটা ভেতরে চলে এসেছে তারা। পথে অনেক ছোট ছোট বাড়ি বেড়ার ঘর চোখে পড়েছে তার। পুকুরও রয়েছে। এমনকি তেমাথার মোড়ে এক ছোটখাটো কালীমন্দিরও রয়েছে। পুজোও হয়। কানু হাত তুলে প্রণাম করেছে।

—আচ্ছা সুনীল, এদিকের সবাই সন্ধ্যা হতে না হতেই যে ঘুমিয়ে পড়ল। কি ব্যাপার ? আসবার পথে কানু বারবার জানতে চেয়েছে।

—ও কিছু নয়। ও কিছু নয়। এই ভাই রিক্সা একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও না। সুনীল তাগাদা দিয়েছে।

কিন্তু সুনীলের এই ব্যবহারে কানু খুব অবাক হয়ে গিয়েছে। এই একটা বিশেষ জায়গা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাবার জন্যে তার এক অকারণ ব্যস্ততা কানুর চোখ এড়ায়নি। আবার ওদের বাড়ীতে গিয়ে চা-জলখাবার খেয়ে দু-চারটে কথা বলার আগেই সুনীল হাতের ঘড়ি তুলে ধরে চোখের সামনে। কানু অবাক হয়—কি

হ'ল ? এত তাড়া দেবার কি আছে ? এই তো সবে ছ'টা বাজে। সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যেই তো বাড়ি পেঁছৈ যাব। কানু বলে। এমন পরিবেশ ছেড়ে তার যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এ বাড়ির সুখকে আরও একটু বেশি সময় সে যে উপভোগ করতে চায়। কিন্তু সুনীলের সেই এক কথা—না, না কানু তা হয় না, মাসীমা অসুস্থ, বাড়ীতে কেউ নেই। এখন তোমার বাড়ী ফেরা দরকার।

—কেন ? একদিন না হয় একটু দেরিই হ'ল। কানু অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। আসলে সুনীলের এই অহেতুক ব্যস্ততা তার ভাল লাগে না। এত দূর ডেকে এনে বসতে-না-বসতেই তাড়িয়ে দিচ্ছে। খুব অপমান লাগে তার। নাঃ, এখানে তবে আর কেন থাকা ?

কানু উঠেই পড়ে। সুনীলের মাকে প্রণাম করে পায়ে হাত দিয়ে। ওর স্ত্রীকে হাত তুলে নমস্কার করে। ভদ্রতা করে বলে, একদিন চলে আসুন না আমাদের বাড়ি। বাবা রিটায়ার করে ওটা কিনেছিলেন। অবশ্য আমাদের বাড়ী কিন্তু এত সুন্দর খোলামেলা নয়।

—ঠিক আছে যাব একদিন। বলেছেন যখন। তবে আপনিও আর একদিন বেলাবেলি আসুন না গিন্নিকে নিয়ে। ছেলেকে নিয়ে।

কানু জবাব দেবার আগেই সুনীল স্ত্রীর কানে কী যেন বলে। ওর স্ত্রী লজ্জা পায়—কিছু মনে করবেন না। আপনার বাড়িতে এখন মা-কে দেখবার কেউ নেই। আপনারা চলে এলে— ?

—না, না। ঠিক আছে। তাহ'লে আপনারাই আগে আসুন-না ?

কথা বলতে বলতে সময় কেটে যাচ্ছে। সুনীল তাড়া দেয়—এ্যাই তাড়াতাড়ি করো। জেনো তোমায় বাসে তুলে দিয়ে তবেই আমার ছুটি। এই বাসে সোজা চলে যাবে বাড়ী।

ওরা রাস্তায় বের হয়। কিন্তু কপাল! সে যাবে কোথায়? ওই কালীবাড়ীর কাছে আসতে না আসতেই হঠাৎ লাইট অফ্ হয়ে গেল। সুনীল তার হাত চেপে ধরে। বলে—লোডশেডিং। কানু তুমি একটু পাশে সরে দাঁড়াও। আমি টর্চ নিয়ে আসছি। এই যাব আর আসব। তুমি নতুন লোক। রাস্তা ভাল নয় দেখেছ তো। অন্ধকারে হোঁচট খাবে, গর্তে পড়বে।

—ঠিক আছে ঠিক আছে। কানু জবাব দেয়। আমি এখানেই থাকছি।

—ব্যাস্ ব্যাস্। সিগারেটের প্যাকেটটাও আনছি সেই সঙ্গে—বলেই সুনীল অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

অন্ধকারের মধ্যে কানু একা দাঁড়িয়ে থাকে। সে অপরিচিত লোক। দু'চারজন উট্‌কো লোক তার আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। তাকে নজর করছে বলে কানুর মনে হয়। তার বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে। কালীমন্দিরের আলোতে দাঁড়াবার জন্যে কানু এগিয়ে যাবে ভাবল। কিন্তু সুনীল এসে যদি তাকে না পায়? ও এতো দেরি করছে কেন? কানু এগোবে কী এগোবে না, ভাবে।

তার এই দোনামনা ভাব দেখে হেসে ওঠে কে যেন। শিউরে ওঠে কানু। অন্ধকারে একটা নারীকণ্ঠ শোনা যায়—কি দাদা, বন্ধুকে খুঁজছেন নাকি?

—কই না-তো। কানু থত্‌মত্ খেয়ে যায়।

—আরে চলে আসুন। চলে আসুন। বন্ধু পেয়ে যাবেন এখানে।

বলতে না বলতেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে বের হয়ে আসে এক নারীমূর্তি। কানুর হাত চেপে ধরে। আর কানু কিছু বুঝে ওঠবার আগেই টেনে নিয়ে যায় তাদের ডেরায়। কানু অবাক হয়ে যায়।

সারি সারি বেড়ার ঘর। দু'পাশে। মাঝে সরু উঠোন। তারই

মধ্যে ঘরের টিমটিমে আলো বাইরেও আলোছায়ার সৃষ্টি করেছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখে সে চারধারে। এ রকম জায়গা যে এখানে থাকতে পারে কানু বুঝে উঠতেই পারে না।

—হ্যাঁলা। কাকে আবার জুটালি তুই? খোঁপায় ফুল গুঁজতে গুঁজতে বের হয়ে এল কে যেন। মুখে তার এক খিলি পান। তুই পারিসও বটে খদ্দের ধরতে!

—দ্যাখো না দিদি! কী বোকা হাঁদা লোকটা। এখনও দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপছে যেন!

—লম্ফটা তুলে ধরতো। দেখি চাঁদবদনটা একবার। খিলখিল্ করে হেসে বলে মেয়েটি।

—এই দ্যাখো না দিদি। তোমার নতুন নাগর জুটিয়ে এনেছি। হাসাহাসি শুরু হয় সবার।

—আলোটা এবার সরাসরি কানুর মুখে এসে পড়ে। অন্ধকার থেকে এসে হঠাৎ এক আলোর ঝলকানিতে তার চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে। কানু মুখ ঢেকে ফেলে।

কিন্তু হঠাৎ একটা মেয়ে অন্ধকারের মধ্যে কোথা থেকে দৌড়ে এসে পড়ে কানুর পায়ের ওপর—দাদা! তুমি এখানে? তুমি এখানে কেন এলে?

ভয় পেয়ে সরে যায় কানু। কিন্তু পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়ে যায়। সে চোখ খোলে—মরনি! মরনি তুই বেঁচে আছিস্! এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কানু। কিন্তু মরনি তুই বা এখানে কেন? তুই এখানে কেন এলি? কে নিয়ে এল তোকে? উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠে কানু। থরথর করে কাঁপে সে।

মরনি পা ছেড়ে দেয়। এবার উঠে দাঁড়ায়। বলে—হ্যাঁ দাদা আমি বেঁচে আছি। বেঁচে আছি। দেখতেই তো পারছ। বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মরনি। তারপর আঁচল দিয়ে

চোখের জল মুছে নেয়। কানুর হাত ধরে। সহজভাবে। কিন্তু ঘামতে থাকে।

মরনি রুদ্ধ বিষন্ন কণ্ঠে বলে—দাদা, যে মরনির জন্ম দিতে গিয়ে মা মরেছে, যে মরনিকে বারো তেরো বছর বয়সে দাদা বৌদির সংসারে হাড়ি ঠেলতে তাদের হাতে লাঠি ঝাঁটা খাবার বরাত দিয়ে ঘর ছেড়েছে তার বাবা বিবাগী হয়ে—সেই মরনি শত দুঃখ কষ্ট বেদনাতেও মরে যায়নি। মরনি মরেনি, মরছিল না। সেই মরনি আপনার কাছে গিয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিল। কি হ'ল তার? এখানে এসে সেই মরনি মরে গেছে। মরে বেঁচে আছে ফুলি। অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে আবেগে কাঁপতে থাকে সে। তারপর একটু স্থির হয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে—চলুন! দাদা, আমার ঘরে বসবেন চলুন।

মরনি অন্য মেয়েটিকে কী যেন বলে। কানু শুনতে পায় না। কিন্তু দেখে সে জিভ কেটে সরে গেল।

মরনির ঘরে এসে অবাক হয়ে যায় কানু। ঘরের বেড়ার দেয়ালে ঠাকুর দেবতার ছবি। একটা টুল বের করে দেয় মরনি চৌকির তলা থেকে। বলে—দাদা বসুন। অন্য একটা মেয়ে এরই মধ্যে চা নিয়ে এসেছে। মরনির হাতে দিয়ে বের হয় সে। মরনি চায়ের কাপ কানুর হাতে ধরিয়ে দেয়—দাদা নিন।

সেই মরনি? তার বাড়ীতে যে মেয়েটা ছিল? কানু আর নিজেকে চেপে রাখতে পারে না। বলে—মরনি সেই দিনের পর আজ পর্যন্ত তোমায় কত খুঁজেছি আমি। তা কি জানো? কেন তুমি চলে এলে না? পালালে না কেন এখান থেকে?

এ সব কথার জবাব দেয় না মরনি। চুপ করে থাকে। পরে বলে—দাদা! কিন্তু তমি এখানে কেন? এ জায়গায় তো তোমার

আসার কথা নয়। বলো বলো মা কেমন আছেন? বৌদি, খোকন সোনা?

কানু আর কথা বলতে পারে না। গলা ধরে আসে তার। বলে—ওরা, ওরা ভালই আছে। আছেন একরকম। কিন্তু মরনি আমি যে ভাল নেই। তুমি, তুমি এখানে কেন এলে? কি করে এলে? আমায় বলো।

এবার মরনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার কথা শুরু করে—দাদা, সেদিন তো তুমি নেমে গেলে। বাসটা ধর্মতলা ছাড়িয়ে আর একটু এসেছে কী আসেনি ব্যাস্‌ খারাপ হয়ে বসে থাকল। ড্রাইভার চেষ্টা করলেন অনেকবার। কিন্তু কিছু হ'ল না। লোকজন সব গালমন্দ করতে করতে নেমে গেল। ও রাস্তা তো আমি চিনি না। কণ্ডাকটরকে বললাম—দাদা আমাকে একটা বাসে তুলে দিন না। সে কিন্তু সরে পড়ল কোনও জবাব না দিয়ে। যাত্রীরাও যে যার মতো একে একে সরে পড়ল। আমি আর দু'চারজনই রয়ে গেলাম কেবল। দেখি একটা ট্যাক্সি হাঁকছে—রাসবিহারী রাসবিহারী! ক'জন লোক একজন মেয়েও ছিল ভেতরে। আমি ভরসা করে উঠে পড়লাম। তারপর—? মরনি আনমনা হয়ে যায়। কেঁদে ফেলে। না দাদা, আর কিছু শুনতে চেয়ো না আমার থেকে। ওরা মরনিকে মেরে ফেলল। জন্ম দিল ফুলির। আর একদিন আমি চলে এলাম এখানে। ভালই আছি। ভালইআছি। আকুল হয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকে মরনি।

কানু অবাক হয়ে যায় কথা শুনে। বলে—বেশ মরনি। কিন্তু তুমি তো জানোই না যে তোমার জন্যে আমার সংসারে কী অবস্থা হয়েছে আমার। তোমার বৌদির ধারণা তোমাকে ভোগ করার জন্যে আমিই তোমায় কোথাও লুকিয়ে রেখেছি। সে আরও খিটখিটে হয়েছে। লোকেও হয়ত এমনটি মনে করে। না মরনি, আমি

আর তোমায় কিছু বলব না। শুধু অনুরোধ। দাদা হয়ে তোমার কাছে অনুরোধ—অন্ততঃ একবার আমার সঙ্গে চলো।

কথা বলতে বলতে কানু অধীর হয়ে পড়ে। তার চোখের কোণে দু'এক ফোঁটা জলও এসে জমা হয়। কিন্তু মরনি চুপ। চুপ করেই থাকে সে। কেমন যেন উদাসীন।

—মরনি? কি হ'ল মরনি? কথা বলছ না যে? কানু বিব্রত ও ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

মরনি তখনও কী যেন চিন্তা করছিল।—দাদা—! কি যেন বলতে গিয়েও সে থামে। ঠোঁট দু'টো কেঁপে কেঁপে ওঠে তার। কথা যেন আটকে যায়।

—দাদা··· ! তবুও মরনি কিছু বলতে পারে না।

—কি হ'ল মরনি? বলো, কি বলবে বলো? কানু সহজ হতে চায়।

—দাদা! মরনি এবার কথা বলে।—আমায় নিয়ে কি করবেন? সে জানতে চায়।

—ও, এই কথা? তুমি যেমন আমাদের বাড়ীর একজন হয়ে ছিলে তেমনই থাকবে। অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে ফেলতে পেরে হালকা হয় কানু।

কিন্তু কানুর কথা শুনে মরনি থর্‌থর্‌ করে কেঁপে ওঠে। দাদা—, চোখের জল সে আর চেপে রাখতে পারে না—কিন্তু আমি যে নষ্ট হয়ে গিয়েছি দাদা! আমি যে নষ্ট হয়ে গিয়েছি! হাহাকার করে ওঠে মরনি। মার সেবা তো আমি আর করতে পারব না। পারব না কিছুতেই।

কানু চুপ করে থাকে। কথা বলতে পারে না সেও। তারপর বলে—ঠিক আছে মরনি, তুমি কম-সে-কম একবার চলো বাড়িতে। তোমার বৌদির সঙ্গে দেখা করে বলো তুমি বেঁচে আছ। হাত জোড় করে কানু। বড় স্বার্থপর শোনায় তার কথা।

মরনি এবার হেসে ফেলে এ সব কথা শুনে। কানুর দিকে অবাক হয়ে তাকায়। তারপর বলে—ঠিক আছে। তাই বেশ ভাল হবে। আমি বৌদিকে বলব—সবাইকে ডেকে ডেকে বলব—আমি অন্য বাড়ীতে অনেক, অনেক ভাল কাজ পেয়েছি। তারা ভাল ভাল খেতে পরতে দেয়। অনেক যত্নে রেখেছে আমায়। তাইতো আমি এ বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়েছি। দাদাকে কত টাকা পাঠাই। কত কত সুখে আছি সেখানে।

কথা শেষ করে মরনি পাগলিনীর মতো হাততালি দিয়ে ওঠে। হাসে। ছোট ঘরটাতে নেচে নেচে বেড়ায়। ওর সেই কাণ্ডকারখানা দেখতে অন্য মেয়েরাও একে একে এসে জোটে। মরনি তখনও হাসছিল আর গাইছিল।

কানু আর দাঁড়াতে পারে না সেখানে। তাড়াতাড়ি সরে পড়ে। প্রায় পালিয়েই আসে বলতে গেলে।

একটু দূরে গিয়ে কানু দাঁড়ায়। তখনও ভেসে আসছিল মরনির হাসি। কানু কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে। কিন্তু আস্তে আস্তে সেই হাসিও মিলিয়ে যায়। তার বদলে এক বুকফাটা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে কেবল। কানু আর শুনতে পারে না। তার কানে যেন আগুন জ্বলছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁপায়। এক দৌড়ে বাসরাস্তায় চলে আসে সে।

তাকে দেখতে পেয়ে এবার কোথা থেকে যেন দৌড়ে আসে সুনীল। তার হাত চেপে ধরে—কোথায় ছিলে এতক্ষণ? তোমায় কী খোঁজাটাই না খুঁজতে হ'ল। ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে।

কানু তাকায়। দেখে সুনীলের চেহারাও উদ্‌ভ্রান্ত। সে কোনও কথারই জবাব দিতে পারে না। বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে শুধু।

তার ওরকম অবস্থা দেখে সুনীল বলে—বুঝেছি। বুঝতে পেরেছি। এই নষ্ট পট্টির কারও খপ্পরে তুমি পড়েছিলে।

অপরিচিতরা এমন ঝামেলায় পড়েছে আগেও। যাক্ ভগবান্ বাঁচিয়েছেন। ভাগ্যিস্ চলে আসতে পেরেছ। চলো আর তোমায় ছাড়া নেই। এবার তোমায় বাসে তুলে দিয়ে তবে আমার ছুটি। বাস দেখে হাত দেখায় সুনীল।

তারপর এক ঘোরের মধ্যে দিয়ে কানু বাড়ি ফেরে। কখন যে বাসে উঠল কখন বসল কখন নামল কখন টিকিট কাটল সব যেন স্বপ্ন! কিন্তু মরনির সেই বুকফাটা কান্না সে কিছুতেই ভুলতে পারে না।

দিন রাত মাস বছর আবারও ঘুরে যায় কিন্তু মরনির কান্না যেন কানুর কানে বেজেই চলে। নিজেকে অপরাধী মনে হয় তার।

কিন্তু আজ ভাবে সে, এভাবে হারিয়ে যাবার জন্যই কী মরনিদের জন্ম? আসলে মরনিরা বোধ হয় এভাবেই হারিয়ে যায়। মাঝে মাঝে কানুরা আসে তাদের জীবনে। একটু আলো দেখায়। কিন্তু এক ঝড় কোথা থেকে এসে সেই আলো সেই আলোর বাহক-দের কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়। মরনিরা হারিয়ে যায়। কেবল ঝরে পড়ে থাকে তাদের ক'ফোঁটা চোখের জল। বেদনা আর হাহাকার। অথচ কে তাদের খবর রাখে? কে দেখে চোখের জল? কে শোনে হাহাকার ধ্বনি! কেউ না, হয়তো কেউ না।

কিছু পলাশের নেশা

—আচ্ছা, আপনারা কেউ যেতে রাজি নন কৈলানে? এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ কুটুম্বা রাও দেয়ালে টাঙানো বিরাট ম্যাপটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। বেশ কিছুদিন হল এখানকার কাজ শুরু হয়েছে, কিন্তু কাজ এখনও কত বাকি রয়ে গিয়েছে। ওপরওয়ালাদের হুকুমের সঙ্গে একটা অনুরোধও ছিল কাজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করবার জন্যে। মিঃ ভট্টশালী খুব ভাল কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু তারপর যেন কাজ আর শেষই হতে চাইছে না।

তাই আজ পাঁচজন সহকর্মীর কাছ থেকে সম্মতি পাবার আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন মিঃ কুটুম্বা রাও। কিন্তু কিছুক্ষণ কেটে গেলেও কোন জবাব-ই তিনি পেলেন না। বিরাট ঘরটায় কেবলমাত্র ফ্যানটার আওয়াজের সঙ্গে দেয়াল ঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজ তাল মেলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছিল। সার্ভে রিপোর্ট, রোড ম্যাপ, প্রোগ্রেস রিপোর্টে ঠাসা ঘরটায় কেমন যেন এক অস্বস্তি, কেউ যেন মুখ তুলে তাকাবার চেষ্টা করতেও রাজি নয়।

—দেয়ার ইজ নান! নো ওয়ান ইজ রেডী টু গো দেয়ার? মিঃ গুপ্তা, মিঃ পাটিল? বিরাট ঘরটায় এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের ভারি গলার প্রতিধ্বনি যেন কোন ব্যর্থতার ভীতি-কে প্রকাশ করে দেবার জন্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু কেউ যেতে চায় না ঐ দুর্গম দেশে! বরঞ্চ যারা আসে কয়েক মাস পরেই তারা নানান ছল-ছুতোয় পালিয়ে যেতে চায়। কাজে তাই বারবার পড়ে বাধা। ঐ দুর্গম দেশে—

হ্যাঁ, দুর্গম বলে দুর্গম! এখানে আসার পথের একটা হিসাব

মিঃ কুটুম্বা রাও মোটামুটি দিতে পারেন। ডেরাহি অন-সোন থেকে গাড়ি বদল করে ব্রাঞ্চ লাইনে আসতে হয় গারওয়া রোড, যার দেহাতী নাম রেহলা, সেখান থেকে আবার গাড়ি বদল করে আসতে হয় সাব-ডিভিশনাল শহর গারওয়া-তে।

গারওয়া যদিও পালামৌ জেলার সাব-ডিভিশনাল শহর কিন্তু কি-ই বা আছে এখানে? রেল স্টেশন থেকে মাইল দুয়েক দূরে শুরু হয়েছে টাউন। আর সে টাউন-ই বা কি—

তবুও গারওয়া যাই হোক না কেন এখানে মানুষের মুখ দেখতে পাওয়া যায়। সভ্য জগতের সঙ্গে মোটামুটি একটা যোগসূত্রও বজায় রাখা যায়। কিন্তু কৈলান?

কৈলান এখান থেকে কম করেও পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে। আর গারওয়া থেকে সপ্তাহে একদিনই কেবল ওখানে জীপে করে খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্র এবং ডাক পৌঁছে দিয়ে আসা হয়।

কৈলান থেকে অবশ্য আরও অনেক দূরে ভবনাথপুর। সমতলভূমি থেকে কম করেও হাজার দেড়েক ফুট ওপরে এ জায়গাটা। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে অতিকষ্টে ওখানে পৌঁছবার পথ করে নেওয়া হয়েছে। আর এই ভবনাথপুরেই—

হ্যাঁ, আর এই ভবনাথপুরেই আজ পাওয়া গিয়েছে মহামূল্যবান লাইমস্টোনের বিরাট উৎকৃষ্ট সঞ্চয়। তাছাড়াও এখানে পাওয়া গিয়েছে হিমাটাইট, ডলোমাইট প্রভৃতি আরও কিছু কিছু মূল্যবান খনিজ পদার্থ।

বোকারো স্টীল প্ল্যাণ্টে চুনাপাথরের এই সম্পদ পৌঁছে দিতে হবে। দেশের অগ্রগতির পথে এ হবে এক নব সংযোজন। শুধু বোকারো কেন, বার্নপুরেও পাঠান হবে এখানকার চুনাপাথর। কর্তৃপক্ষ তাই মাত্র তেত্রিশ কিলোমিটারের মতো রাস্তা তৈরি করতে চারকোটি টাকার বাজেট নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। এই রেলপথ দেশের উন্নতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

গারওয়াতেই বসেছে কনস্ট্রাকশনের হেড অফিস। আর আপাততঃ হাজার ফুট উঁচু কৈলান-এ দু-চারটে তাঁবু পেতে এই কাজের তত্ত্বাবধানের জন্যে লোক রাখা হয়েছে।

কিন্তু ঐ পাণ্ডববর্জিত দেশে আজ I O W-র পদ নিয়েও কেউ যেতে চায় না। A I O W-রাও ডেপুটেশনে ওখানে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। আরও বেশি সুযোগ সুবিধার জন্যে তারা চাপ দিচ্ছে। অথচ এদিকে বর্ষা এসে যাচ্ছে। গতবার খরা গিয়েছে কাজও বেশি এগোতে পারে নি, কিন্তু এবার বর্ষা এলে সমস্ত প্রকল্পটাই বানচাল হয়ে যেতে পারে, অন্ততঃ পিছিয়ে যেতে পারে বেশ কয়েক বছর। সার্ভিসে গুড রেকর্ড, প্রমোশনের প্রলোভন, কিন্তু তবুও ভাল লোক পাওয়া যায় নি।

—নান্, নান অব য়ু, প্রচণ্ড হতাশ হয়ে বসে পড়লেন মিঃ কুটুম্বা রাও।

আর সেই সময় ঘরের অখণ্ড নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়িয়েছিল সাংখ্যায়ন মিত্র! —ইয়েস স্যার, য়্যাম রেডি টু গো দেয়ার।

—তুমি? নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার।

কিন্তু পঁচিশ বছরের তরুণের দৃঢ় কণ্ঠস্বরের উষ্ণতায় ঘরের নিঃস্তব্ধতার বরফ তখন গলতে শুরু করেছে। অন্যদের বিস্ময়ের ঘোর তখন যেন কেটে গিয়েছে। আর ভুল ভেঙ্গে দিয়েছে মিঃ কুটুম্বা রাও-র, '—ইয়েস স্যার, আই উইল গো।'

কিছুক্ষণ অভিভূতের মতো হয়ে গিয়েছিলেন মিঃ কুটুম্বা রাও। কেননা বারবার নতুন লোক আনিয়ে কাজ করা। যাহোক তারপর যেন ঘোর কেটেছিল তাঁর-ও, আর 'বেস্ট লাক, বেস্ট উইশেস্ মাই ডিয়ার বয়' বলে সহাস্যে সাংখ্যায়নের পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন তিনি।

একটা প্রমোশন, তারপর আরও একটা প্রমোশনের পর তাকে আটকায় কে? মনে মনে ভেবেছিল সাংখ্যায়ন।

আজই কৈলান-এ তার প্রথম দিন। অথচ কালকের ঘটনাটাই যেন কোন্ সুদূর অতীতে ঘটে গিয়েছে বলে মনে হয়।

একা একা বসে সাংখ্যায়ন ভাবছিল এসব কথাই। দেশ দেখে বেড়াবার সাধ তার অনেকদিনের। রেলে চাকরি পেয়ে ঘুরেছেও অনেক। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র-র পালামৌ-র আকর্ষণ তার কাছে অন্যরকম, ভাল লাগা আর ভালবাসার আকর্ষণ। বরকাকানা থেকে বদলী হয়ে এখানে আসার পর সে কম দেখেনি, কম জানার চেষ্টা করেনি।

ছোটনাগপুর ডিভিশনের অন্যতম জেলা পালামৌ-র তিনটে সাব-ডিভিশনাল টাউন হল লাতেহার, ডালটনগঞ্জ, গারওয়া।

কিন্তু গারওয়া আর তার চারপাশে ঘুরে বেড়াবার সুযোগই হয়েছে তার কেবল। বৃহস্পতিবার এখানে হাট বসে, সেই হাটের সে নিয়মিত যাত্রী।

তাছাড়া গারওয়ার পোস্ট অফিসে যাবার একটু আগে বড় রাস্তা ধরে যেতে বাঁদিকে দুটো রাস্তা চলে গিয়েছে, একটা গিয়েছে এখানকার হাট, আর বাজার বসার জায়গায় গিয়েছে অন্যটা। এই রাস্তা ধরে একা একা হাঁটতে হাঁটতে সে গারওয়া ছাড়িয়ে টারওয়া-য়, আবার কোনও কোনও দিন আরও দূরের পাচপারওয়ায় পৌঁছে গিয়েছে। এই পথে হাঁটলে প্রথমে চোখে পড়ে ভারু নদী। নদীর ওপর বেশ সুন্দর ব্রীজ রয়েছে। নদী কিন্তু একদম বালি ভর্তি। নদীর একপ্রান্ত দিয়ে অবশ্য কাকচক্ষু জলধারা তিরতির করে বয়ে চলেছে। সাংখ্যায়ন দেখেছে নদীর বালি খুঁড়ে ছেলে বুড়ো অনেককেই জল সংগ্রহ করতে। টারওয়ার প্রায় প্রান্তসীমায় এসে রাস্তাটা বেঁকে গিয়েছে। পাচপারওয়া-র পর রঙ্কা। রঙ্কা

থেকে রাস্তা চলে গিয়েছে ভাণ্ডারিয়া-তে। আর রঙ্কা থেকে আরও একটু এগোলে পড়বে গোদরমানা। এখানে কনহার নদী বিহার ও মধ্যপ্রদেশের সীমানা। মধ্যপ্রদেশের প্রথম জনপদ রামানুজগঞ্জ। আর একটু এগোলে অম্বিকাপুর। টারওয়ার প্রান্তসীমার কাঁচা রাস্তা ধরে ডালটনগঞ্জ মাত্র কুড়ি মাইল।

এসব পথ-ঘাট আজ সাংখ্যায়নের কত কাছের। তারা কত আপনজন তার। কিন্তু শুধু শহরের দিকেই না। রেল লাইনের ওপারের বাণ্ডা পাহাড়, আর লহসুনিয়া পাহাড়ও তার কম প্রিয় নয়।

তবু লহসুনিয়া পাহাড় সম্পর্কে তার কী ভীতিই না ছিল প্রথম দিকে। অথচ ভয়ের ওপারে ভয় ছাড়া যে এত সুন্দর আনন্দ আর পরিপূর্ণতাকে পাবার পথ রয়েছে তা সে জানত না। অবশ্য রেলের ক্যাজুয়াল লেবারদের কাছ থেকে সে জেনেছিল বাঁ দিকে পড়ে কেরওয়া টোলা আর ওদিকে পাহাড়ের ওপারে প্রথমে পড়বে মুসলমান প্রধান গ্রাম গুরদী। তারপর আরও অনেকটা চলে গেলে গ্রাম পড়বে সংরাহী। কিন্তু এত সব জানলে কি হবে? পাহাড়ের মধ্যেকার ওই পথ ডিঙ্গিয়ে যেতেই তো ছিল ভয়। ও পথ কেমন? ওপার থেকে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে না তো? একলা পথে কতই তো বিপদ চলে আসতে পারে। কিন্তু একদিন সাহসে ভর করে ভয়ের ওপারে ভয়কে দেখে আসার কেমন যেন এক আকর্ষণ অনুভব করেছিল সে। আসলে পাহাড়টা ডিঙ্গাতেই বড় ভয় লাগে। বেশ কিছুটা ওঠার পর দুটো পাহাড়ের মধ্যেকার ঐ সরু পথ সত্যিই বড় ভয়ের। মন হয় সমস্ত প্রকৃতি যেন এখানে কোন্ এক মৌনতায় সমাহিত রয়েছে। আর মাঝে মাঝেই নানারকম ঘরে-ফেরা পাখির ডাক বড় বিব্রত করে। সন্ধ্যা যখন নেমে আসে হঠাৎ করে, তখন ঘুঘুর একটানা আওয়াজ বুকে কেমন যেন এক কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়, নিজেকে বড় বিব্রত বোধ হয়। তবুও পাহাড়ের মাথা থেকে দূরের, বহুদূরের সুন্দর পাহাড় দেখে যেন চোখ

জুড়িয়ে যায়। আর নিচের দিকে তাকালে শুধু সবুজের মেলা. দেখে মন যেন ভরে যায়। আসলে এখানে প্রকৃতিকে যেন বড় বেশি ভালবাসতে ইচ্ছে করে!

ফেলে-আসা দিনের স্মৃতি মানুষকে এমনি করেই ভরে রাখে। মনকে একটু ফাঁকা দেখলেই ছোট বড় নানান স্মৃতিরা কোথা থেকে যেন উড়ে আসে।

তাই ছোটখাটো নানান ঘটনা সাংখ্যায়নকে যেন আজ পেয়ে বসেছে।

মাঝে মাঝে রাতের ঘুম তার ভেঙ্গে গিয়েছে গারওয়া-য়। ঘুম ভেঙ্গে হঠাৎ চমকে উঠেছে সে, 'হো·· হো'—আবার দূর থেকে ভেসে এসেছে তার জবাব 'হো....হো'। রাতের পাহারাদারেরা তার রাতের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালেও তাদের ঐ আওয়াজ কেমন যেন এক অনির্বচনীয় আমেজ এনে দিত। হঠাৎ আওয়াজে ঘুম ভেঙে যাবার পর সেই আওয়াজে যেন প্রাণের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সাংখ্যায়নের ঘুম ভাঙলেও হঠাৎ 'হো ··হো হো' আওয়াজ কোন্ সুদূর অতীত থেকে যেন জীবনের বেঁচে থাকার দাবির কথাটাই ঘোষণা করে দিয়েছে। মনেপ্রাণে জাগিয়েছে বেঁচে থাকার আশা এবং আশ্বাস।

তবুও মাঝে মাঝে কেমন যেন অসহায় আর একা বলে বোধহয় সাংখ্যায়নের নিজেকে। কিন্তু একদিন তার নিজেকে এমন মনে হত না। সেসব অবশ্য স্কুল লাইফের কথা।

কিন্তু এই প্রকৃতিই একদিন ভয়াল বন্যার রূপ ধরে সাংখ্যায়নদের সুন্দর সংসার ছারখার করে দিয়েছিল। তার মা-বাবা, ছোট ছোট দুই ভাইবোন, সবাইকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

পাগলের মতো সাংখ্যায়ন সেদিন তার প্রিয়জনদের খুঁজে বেড়িয়েছে। কিন্তু ক্রুর, ভয়াল, ভীষণ প্রকৃতি বারবার অন্ধকারের রূপ ধরে এসে তাকে কোন অতলে তলিয়ে দিয়েছিল।

আর আজ ? আজ সেই নিষ্ঠুর প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটা সুযোগ এসে গিয়েছে সাংখ্যায়নের হাতে।

···উড়িয়ে দেব, ভেঙ্গে গুঁড়োগুঁড়ো করে দেব প্রকৃতিকে, প্রকৃতির বিভীষিকার রাজত্ব শেষ করে দিয়ে সেখানে উড়িয়ে দিয়ে যাব মানুষের জয়ধ্বজা।

প্রতিশোধ, প্রতিশোধ, হ্যাঁ প্রতিশোধই নিতে হবে, ভাবল সাংখ্যায়ন। দাঁতে দাঁত চেপে কেমন যেন এক শপথের মতো উচ্চারণ করল কথাগুলো সে। না, না আর কোন ভাবনা চিন্তা নয়, এবার কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

মা, বাবা, ছোট ভাই-বোন সত্যিই সুন্দর। আর এই ছোট্ট পাথরের টিলাটা, যার ওপর সে বসে আছে, সেটাও তো বেশ, বেশ সুন্দর।

বিরাট বিরাট পাহাড়কে ডিনামাইট দিয়ে চুরমার করে ভেঙে ফেলে তার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে।

তাছাড়া প্রকৃতির সঙ্গে তারুণ্যের এই সংগ্রামে যে এক মাদকীয় উত্তেজনা, উদ্দীপনা আছে তা সাংখ্যায়ন অনুভব করছিল।

এই পথ দিয়েই রেলপথ চলে আসবে। গারওয়া থেকে এগারো কিলোমিটার দূরের স্টেশন।মেরাল গ্রাম। এখান থেকে নতুন পথ যাবে কৈলান, কৈলান হয়ে পথ চলে যাবে ভবনাথপুর।

মেরাল থেকে সোজা লাইনে চলে গিয়েছে রমনা, নগরওন্টারী বিনভামগঞ্জ, রেনুকোটের অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরী হয়ে চোপান। চোপান থেকে চুরুক হয়ে পথ গিয়েছে চুনারের দিকে।

ঐ পথের কথা মনে হলে প্রথমেই তার মনে পড়ে নগরের কথা। নগরের বিখ্যাত শ্রীবংশীধরজীর মন্দির একদিন সে দেখতে গিয়েছিল। পরিচয় করেছিল ওখানকার রাজা মাণিক বাচার সঙ্গে। শুনেছিল মন্দিরের বংশীধরের অপূর্ব গল্প।

অতি প্রাচীনকালে বাঁকী নদীর তটে নগরওণ্টারী ছিল এক ছোট সুন্দর গ্রাম। কিন্তু তার আশেপাশে ছিল জংলী এলাকা। সেই সময় শিবাজীর দুই সেনাপতি রুদ্র শাহ আর বড়িয়ার শাহ, 'রাজা পাহাড়ী' ও 'ডেমা' পাহাড়ী-তে লুকিয়ে থাকত, সুযোগ-সুবিধা পেলেই বাংলাদেশ থেকে পাঠানো বাদশাহী খাজনা তারা লুঠ করে নিত। সম্রাট কোনোভাবেই তাদের সায়েস্তা করতে পারছিলেন না। শেষে এখানকার ভাইয়া সাহেবের এক পূর্ব পুরুষকে তিনি এই কাজের ভার দেন। তিনি প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর বড়িয়ার শাহকে হত্যা করেন, রুদ্র শাহ প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু বিজয়ী বাহিনী তার পিছনে ধাওয়া করে এক জায়গায় তাকে পাকড়াও করে। তার মুণ্ডু কেটে দেয় তারা, কিন্তু ঐ কবন্ধ বিচ্ছী নদীর কাছে এসে পড়ে যায়। 'মুড়' পড়েছে বলে ঐ জায়গার নাম আজও রয়েছে মুড়ীসেমর। বিনভামগঞ্জ থেকে মুড়ীসেমর বলেই ওখানকার লোক আজও জায়গাটার পরিচয় দেয়।

ঠিক এই রকম সময়েই শিবাজী তাঁর উপাস্য শ্রীবংশীধরজীর এক স্বর্ণমূর্তি তৈরী করিয়েছিলেন। তাঁর মেয়েও প্রতিদিন এই মূর্তির পূজা করে এসেছেন। শিবাজী একসময় এই মূর্তি এক মারাঠা সর্দারের কাছে দিয়ে তাকে কন্‌হর নদীর কাছে 'শিবপহরী' পাহাড়ের ওখানে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক না কেন তিনি তাঁর উপাস্য দেবতাকে আর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি।

এখন থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে নগরের রাজ শ্রীভবানী সিংহ'র ধর্মপ্রাণা স্ত্রী শিবমানী কুঁঅরীকে বংশীধর তাঁর বালরূপে স্বপ্নে দেখা দেন, তাঁর পূজা করতে আদেশ করেন। অনেক চেষ্টার পর মূর্তি উদ্ধার করা হয়। তারপর হাতীর পিঠে চাপিয়ে নিয়ে আসছেন নগরে, হাতী এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে আর নড়তে চায় না। ওখানেই উঠেছে শ্বেতশুভ্র মন্দির। পরে অবশ্য

বেনারস থেকে শ্রীরাধিকার এক মূর্তি এনে যুগলমূর্তির পূজা করা হচ্ছে।

মন্দিরটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখে সাংখ্যায়ন তৃপ্ত হয়েছে। মূল মন্দিরের চারপাশে রয়েছে গণেশ, হনুমানজী, সীতারাম, ব্রহ্মা আর শ্বেতপাথরে তৈরি শিব ও তাঁর বৃষের ছোট ছোট মূর্তি।

বিরাট রাজবাড়ি, ঘোড়াশালা, হাতীশালা দেখেছে সে। এখন অবশ্য সবই চূড়ান্ত ধ্বংসের অপেক্ষা করছে। এখানকার বিখ্যাত আনারসের চাষ চোখে পড়েছে দূরের চিৎ বিসরাও গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু তবুও কত কিছুই দেখা যেন বাকি রয়ে গিয়েছে তার।

পালামৌ-তে আর কিছু থাক না থাক এর নামের প্রথম অক্ষরই জানিয়ে দেয় পা তে পাহাড় আছে। সত্যিই তাই, চারিদিকে কেবল পাহাড় আর পাহাড়।

আর পাহাড়গুলিও কেমন যেন অদ্ভূত। সবুজ ঘাসে ঢাকা কিন্তু তার নীচেই লাল পাথর চোখে পড়বে। ঐ পাথুরে রাজত্বে কেমন করে যে ঘন সবুজ ঘাস, বিরাট বিরাট গাছ হয়েছে সে-কথা সাংখ্যায়ন ভেবেই পায়নি।

চারপাশে পাহাড়ের রাজত্বের মধ্যে একটা সমতল জায়গায় দু-চারটে টেণ্ট পাতা হয়েছে একটু দূরে দূরে। সাংখ্যায়ন মিত্রকে তার দু একজন সহকর্মীকে নিয়ে এখানেই থাকতে হবে।

প্রথম প্রথম মনটা যে একটু খারাপ লাগছিল না তা নয়। আর তাই মনের ঐ একটু অবসাদ ভাবটা কাটাতে 'ইনসপেক্টার অব ওয়ার্কস' সাহাব নানা খেলায় মনে মনে মেতে উঠেছিল।

পা-তে আর কি হতে পারে? পা-কি বিড়ির পাতাকে বোঝায়? যখন প্রচণ্ড লু চলে তখন এই জেলার প্রায় ৬০-৭০ হাজার লোক বিড়ির পাতা সংগ্রহের কাজে লেগে যায়। কিন্তু 'পা' বলতে পাহাড়

এটাই যেন ভাল লাগে তার কাছে। লা বোঝায় লাক্ষা, এটা মেনে নেওয়া যায়। মৌ—মৌ-তো মহুয়া। যখন খাবারের প্রচণ্ড অভাব হয় কত লোক মহুয়ার ফল খেয়েই জীবন কাটায়।

কিন্তু এখানকার লোকতো পালামৌ বলে না, কবিত্ব করে না, বলে পলামু। প-তে তারা বোঝায় রক্ত রাঙা পলাশকে, মু-তে নিজেদের দারিদ্র্য আর দুঃখকে বিদ্রূপ করে বলে মূর্খ।

এই সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, দেখাশোনা ছাড়া প্রথম দিনটা ভালই কেটেছিল। মেরাল গ্রাম থেকে কৈলানের দিকে যেতে ২৬ কিলোমিটার দূরে জামিয়ানালায় একটা ব্লাস্টিং-এর কাজ ছিল।

সকাল সকালই কাজের তদারকীতে বের হয়ে পড়তে হয়েছিল। তার পৌঁছাবার অনেক আগে' থেকেই অবশ্য প্রায় শ' দুয়েক শ্রমিক কাজে লেগে গিয়েছিল। ওদের প্রতিদিনের মাইনে দু টাকা চার আনা করে। আসে ছ'-সাত মাইল দূরের গ্রাম থেকে। সকাল ছ'টা থেকে কাজ শুরু করতে হয়. একটা থেকে দু'টো অবধি টিফিন, আবার কাজ চলে পাঁচটা অবধি।

আজকের ব্লাস্টিং ছিল শেষ পর্যায়ের কাজ। এর আগেও এখানে কয়েকবার কাজ হয়ে গিয়েছে। নীচের থেকে পাথর কেটে কেটে ওপরে তুলে আনা হচ্ছিল। যন্ত্র দিয়ে ড্রিলিং-এর কাজ চলেছিল, এ ছাড়াও পাথরে গর্ত করা হচ্ছিল। সাড়ে বারোটা নাগাদ, যখন মজুররা সবাই টিফিন করতে দূরে চলে গিয়েছে তখনই কাজ শুরুর সঙ্কেত দিল সাংখ্যায়ন। প্রায় নব্বইটা জিলাটিনের মধ্যে ডিটোনেটর ভরে গর্তে রাখার কাজ শুরু হল। ব্লাস্টার আর তার দুজন সহকর্মী পলতায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি নিরাপদ দূরত্বে সাহেবের কাছে এসে দাঁড়াল।

তিন মিনিটের মধ্যেই পৃথিবী যেন কেঁপে উঠল। চারদিক ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেল আর পাথরের ছোট বড় নানান মাপের

টুকরো ফুলঝুরির মতো ছিটকে ছিটকে পড়তে লাগল। পৃথিবী দারুণ অক্রোশে যেন ফুঁসতে লাগল।

ধোঁয়া সরলে, প্রকৃতি ঠাণ্ডা হলে সাংখ্যায়ন ক'জন সহকর্মী নিয়ে স্পটের দিকে এগিয়ে গেল। দারুণ ভাল কাজ হয়েছে দেখে আনন্দিত হল সে। ভালভাবে কাজটা শেষ করে ফিরতে ফিরতে তার প্রায় আড়াইটে বেজে গিয়েছিল। এখানে পয়দল মে চলা ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই।

আর দ্বিতীয় দিন, হ্যাঁ দ্বিতীয় দিনটাও ভালই কেটেছিল, অলস ভাবে গল্প করে।

তার এখানে রান্নাবান্নার কাজ করে দেয় রেলেরই ক্যাজুয়াল স্টাফ মাঝবয়েসী রাম খেলাওন। তার কাছ থেকেই এক কঁহানিয়া শুনে সাংখ্যায়নের মনে কেমন এক জেদ চেপে গিয়েছিল।

রামখেলাওন-এর কাহিনীটা বেশ মজার—

কোয়ার্টারের সামনে আধ মাইলের মধ্যেই যে পাহাড়টা চোখে পড়ে তার নাম টাইগার হিলস্। পুরনো নাম অবশ্য রুবিদাস পাহাড়। আর প্রাচীন কাহিনীর মূল ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে এই পাহাড়কে কেন্দ্র করেই।

সে কবেকার কথা তা' আজ আর কেউ বলতেই পারে না। কিন্তু যাকে নিয়ে এ গল্প তার বংশধরেরা আজও রয়েছেন।

হ্যাঁ, কৈলান-এর রাজকুমারকে নিয়েই এই গল্প। সুন্দর, সুদর্শন, তরুণ কুমার প্রায়ই তার সাদা রঙের বিরাট ঘোড়ায় চেপে নিজের রাজত্বের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতেন।

কিন্তু সেদিন হঠাৎই ঘুরতে ঘুরতে তিনি কৈলান নদীর উজান পথ ধরে চলেছিলেন। এখানে পাহাড় বড় অদ্ভুত, একটা পাহাড় শেষ হবার পর তার একটু পিছনেই আর একটা নতুন পাহাড় শুরু হয়েছে।

আর ঘুরতে ঘুরতে নদীর উজান পথে তিনি ঐ পাহাড় ধরে উপরে উঠতে লাগলেন। সেদিন কেন যে এই পাহাড়ী নদীতে জলের স্রোত কম ছিল তা' আজ আর কেউ বলতেই পারে না।

যা হোক এভাবে পথে যেতে যেতে রাজকুমারের চোখে পড়ল একটা অদ্ভুত জিনিস। কোন এক অজানা, অচেনা, অদেখা রমণীর একটা দীঘল কেশ নদীর জলে ভেসে চলেছে। এই সুন্দর কেশ দেখেই রাজকুমার বিমোহিত হয়ে গেলেন। ভাবলেন, এই চুল যার সে না জানি কতই না সুন্দর হবে।

ব্যস্, একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রমণীকে দেখবার জন্যে তার মন আকুল হয়ে উঠল। কিন্তু ঘোড়া পাহাড়ি খাড়াই পথে আর উঠতে পারছিল না, তাই তাকে ছেড়ে দিয়ে তিনি একাকী পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

রাজকুমারের প্রিয় ঘোড়া আস্তে আস্তে গভীর বনপথে কোথায় হারিয়ে গেল তা আর নজরেই পড়ল না।

দীর্ঘপথ হাঁটার পর রাজকুমারের কষ্ট যেন সার্থক হল। দেখলেন, এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে, যেন স্বর্গীয় দেবকন্যা, নদীর জলে কাপড় কাচছে। কিন্তু তার পরিধেয় দেখেই বোঝা গেল যে সে চামারের মেয়ে। তবুও তাকেই নিজের একান্ত আপনার করে পাবার জন্যে রাজকুমার আকুল হয়ে উঠলেন।

এবার তিনি তার কাছে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তার আগেই সেই ভীতা সুন্দরী পালাতে শুরু করেছে। রাজকুমারও এবার পিছন পিছন দৌড়নো শুরু করলেন। ওদিকে সেই সুন্দরীও সাহায্যের জন্যে চিৎকার করতে লাগল, কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, কেউ সে ডাক শুনল না, তার সাহায্যের জন্যেও এগিয়ে এলো না কেউই। আর অল্প দূর গিয়েই রাজকুমার তাকে ধরে ফেললেন।

যে জায়গাটায় তারা এসে পড়েছিলেন সেটাই ছিল পাহাড়ের

সবচেয়ে উঁচু জায়গা। চুড়াটা কিন্তু অদ্ভুত, ওখানে বেশ কিছুটা সমতল জায়গাও রয়েছে।

এখন চামার-কন্যাকে ধরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সে তো বিবশ হয়ে পড়ে গেল। আর রাজকুমারকে এই অভিশাপ দিল যে, এই পাহাড়ের কাছে এরপর যে আসবে তাকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং এই কৈলান রাজার রাজত্বেও কোন চামার থাকবে না।

এর অল্পক্ষণ পরেই সেই মেয়েটি মারা গেল। আর তার মৃত্যুস্থানে একটা জলপূর্ণ চৌবাচ্চার সৃষ্টি হল।

এই জলাধারটি বড়ই আশ্চর্যের। সারা বছর খরা হলেও ঐ জলাধারের জল ঠিকই থাকে। আর সেই আদ্যিকাল থেকেই ঐ জলাধারে রয়ে গিয়েছে একটা সাপ।

তারপর অনেক, অনেকদিন পর, এই পাহাড়ের ভীতিও একদিন শেষ হয়েছে। আর এখন প্রতি বছর ভাদ্র সংক্রান্তিতে ঐ পাহাড়ের রাজত্বে ঐ চৌবাচ্চাকে কেন্দ্র করে ঐ বিরাট জঙ্গলের রাজত্বেও এক ছোট-খাটো মেলা বসে থাকে।

কিন্তু আজও কৈলান-এ একজন মুচিরও দেখা পাওয়া যায় না। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে বছরের ঐ দিনটিতেই সাপটি কেবল জলাধার ছেড়ে বের হয়ে এসে তার জন্যে রাখা দুধ-কলা খেয়ে থাকে।

আর তাই তৃতীয় দিন তাড়াতাড়ি কাজ সেরে পাহাড়ে চড়ার আকর্ষণটা সাংখ্যায়নকে পেয়ে বসেছিল। এই পাহাড়ের কেমন যেন একটা অলৌকিক আকর্ষণ আছে। পাহাড় যেন দু-বাহু বাড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

দুবার তারুণ্যের তেজে ঐ কষ্টকর খাড়াই পথে উঠে সাংখ্যায়নও দেখে এসেছে সেই জায়গা। অবশ্য সঙ্গে নিতে হয়েছিল যুগল, রামারাম ও আরও দু' চারজনকে। বেশ কিছুটা ওপরে ওঠার পর

মনে হয় পাহাড়ের মাথাতেই উঠে এসেছে তারা। কিন্তু টেণ্ট থেকে যে পাহাড়টা দেখা যায়, তার ওপর যে আরও একটা পাহাড় রয়েছে সে কথা সাংখ্যায়ন কেমন করে জানবে ? এখানে যে সমতল জায়গাটা রয়েছে তাতে শেলাই বন, আমলকীর বন, চিরঞ্জীব বন ছাড়াও আর কিছু গাছের ঝাড় জায়গাটা একদম অন্ধকার করে রেখেছে।

এরপরের ওঠা তার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অনেক কষ্টে, অনেক ঘাম ঝরিয়ে, পাথরের বিরাট চাঁইয়ের মধ্যেকার সংকীর্ণ পথ দিয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে সাংখ্যায়ন। ওপরটা এক সমতল মাঠ, কিন্তু সবুজের বদলে কেবল প্াথর দিয়ে মোড়া।

ঐ কূয়োর কাছে যাবার আগে অন্যরা পায়ের জুতো খুলে রেখে প্রণাম করল। ওখানে লাল-নীল কাঁচের চুড়ি আর মাটির তৈরী লাল রংয়ের ছোট ছোট ঘোড়ার মূর্তি পড়ে থাকতে দেখল সে।

ঠিক অতটা ভক্তি না থাকলেও, জুতো না খুললেও, চৌবাচ্চার একটা সাপকে নির্জীব হয়ে পড়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়েছে সে। যেন আদ্যিকালের সাপটাই আজও রয়েছে ওখানে। বাইরে যখন বৃষ্টি নেই, অবিশ্রান্ত সূর্যদেবের হল্‌কা গায়ে বিঁধছে, তখন ওখানে জলাধারের ভর্তি জল দেখে তার অবাক লেগেছে।

তারপর বাড়িতে এসে বিজ্ঞানের ছাত্র সাংখ্যায়ন কোনও যুক্তিতর্ক দিয়েই এ সমস্যার সমাধান করতে পারে নি।

যতবারই সে কোনও যুক্তির পথ ধরে এগিয়ে যেতে চেয়েছে ততবারই পাহাড় যেন তার তীব্র কটাক্ষপাতে সে ভাবনার ইতি টেনে দিয়েছে।

কেমন যেন একটা গ্রাস করার ভীতি, একটা অজানা আতঙ্ক, সমস্যার সমাধান করতে না পারার ফলে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যাবার চেতনা তার সত্তাকে বারবার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

ভাবতে ভাবতেই ছোটবেলার একটা কথা যেন হঠাৎ-ই মনে পড়ে

গেল। সেটা স্কুলের একটা ইয়ারলি পরীক্ষার কথা। পড়াশোনায় সে মোটামুটি ভালই ছিল, কিন্তু অঙ্ক পরীক্ষার দিন কী যে হয়ে গেল।

জ্যামিতির একটা সোজা সমাধান করতে গিয়ে ভুল হল তার। ব্যস, তারপর পাটীগণিতের অঙ্ক, বীজগণিতের অঙ্ক, যেটাই সে করতে চায় সবই একে একে ভুল হওয়া শুরু করল।

সেদিন সাংখ্যায়নের মনে হয়েছিল সে যেন পাগল হয়ে যাবে। তার স্মৃতিশক্তি আস্তে আস্তে যেন ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল, মাথার মধ্যে সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল, অধীত অর্জিত বিদ্যা সব যেন কোথায় হারিয়ে গেল—

আস্তে আস্তে সে যেন কোন অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া শুরু করল। আর তাই এক শূন্যতাকে সঙ্গী করে নিয়ে তাকে হল থেকে বের হয়ে আসতে হয়েছিল সেদিন।

অথচ সেদিন যদি কেউ তাকে একটু সূত্রও ধরিয়ে দিত, একটা ছোট অবলম্বনও যদি সে পেত, তা হলে—

অবশ্য বাড়ি এসে মার কোলে মুখ গুঁজে কান্নার সময় একটা অবলম্বন সে পেয়েছিল।

একটা অবলম্বন পেলে, একটা অবলম্বন পেলে....ছোটবেলার কথা মনে হতেই কেমন যেন উদাস হয়ে যায় সাংখ্যায়ন।

চতুর্থ দিনটাও খুব মজায়ই কেটেছে বলতে হয়, সাংখ্যায়ন মনে মনে হেসেছে। বিশাখা চ্যাটার্জী—

হ্যাঁ, কালই অডিটের জন্যে দিন সাতেকের কাজে এখানে এসেছেন প্রৌঢ় রামকিঙ্কর ব্যানার্জী। সঙ্গে এসেছেন তাঁর শালী, সদ্য বি-এ পাশ করা, হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্রী বিশাখা চ্যাটার্জী। পাহাড়ে চড়ার শখ।

তার সঙ্গে আলাপ করে, পাহাড়ের গল্প শুনে তখনই নিয়ে

যাবার জন্যে কেমন জেদ ধরেছিল। সুন্দরী, তন্বী তরুণী। এই পাহাড়ী রাজত্বে এ যেন এক নতুন প্রাণের স্পন্দন।

বাড়িতে এসে কিন্তু বড্ড ভাবনায় পড়ে গিয়েছিল সাংখ্যায়ন। গতকাল রামখেলাওনের শরীর খারাপ বলে সকালেই ছুটি নিয়ে গাঁও-এ চলে গিয়েছে। অথচ আজ এখনও সে ফিরে আসে নি। দুদিন হাত পুড়িয়ে যাও-বা কোনরকমে খাওয়া গিয়েছে, কিন্তু কাল ?

—বাবুজী ! হঠাৎ রামখেলাওনের গলা শুনতে পেয়ে যেন সম্বিত ফিরে পেল সাংখ্যায়ন।

এই যে রামখেলাওন। কিন্তু তোমার সঙ্গে ও কে ?

ইয়ে মেরী লেড়কী লছমী হ্যায়, বাবুজী। হ্যাঁ, সত্যি, লক্ষ্মীই বটে, মনে মনে ভাবে সাংখ্যায়ন।

কিন্তু—একে কেন নিয়ে এসেছ তুমি ?

বাবুজী, রামখেলাওন বলে চলে, মেরা আভিতক্ আরাম নঁহি হুয়া। মেরী লেড়কীহি দো-তিন রোজ আপকা সব কাম করেগী। মেরী লেড়কী বহোৎ আচ্ছি হ্যায়, বাবুজী।

কিন্তু এর সাদী হয় নি রামখেলাওন ? চৌদ্দ-পনের বছরের বাড়ন্ত গড়নের সুন্দরী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একথা জিজ্ঞাসা না করে পারল না সাংখ্যায়ন।

নঁহী, বাবুজী। রামখেলাওন বলে। মেরী লেড়কী মেরা ছোটে ভাইকে সাথ ডালটেনগঞ্জ মে থী। উধার তো ওহ্ সাঁতোয়া কিলাস্ তক্ পাশ লে লিয়া। লেকিন ও টাইম মেরী লেড়কী বহৎ সেয়ানা হো গয়ী তো ম্যাঁয় ঘরমে লায়া—

কিন্তু মোটামুটি লেখাপড়া জানা এই মেয়েটির বর জুটল না ? ওহো, বলছ, লছমীর উপযুক্ত বর হতে হবে তো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতো ঠিকই কথা—

আচ্ছা, আচ্ছা, রামখেলাওন তুমি ভাল হয়েই এসো—

পরের দিন সাইট্ থেকে ফিরে এসে ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গিয়েছে সাংখ্যায়ন। কী সুন্দর পরিপাটী করে বিছানা পেতে রেখেছে লছমী। আয়নাটাও মুছে ঠিকঠাক করে এখন বোধ হয় টুকিটাকি কাজ করছে সে। আয়না দিয়ে পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত সাংখ্যায়নের চেহারা কেমন যেন অদ্ভুত লাগে নিজেরই কাছে।

—আপকী চায় বাবুজী! কখম যে লছমী চা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সাংখ্যায়ন তা জানতেই পারে নি।

চা খেয়ে বাইরের খাটিয়ার ওপর বসে সাংখ্যায়ন ভাবছিল, মেয়েটি বেশ। কেন যে বিয়ে হয় নি!

একটু বিশ্রাম করে রামকিঙ্করবাবুর ওখান থেকেই ঘুরে আসবে কি-না ভাবল সে। কিন্তু ওদের টেণ্ট যেন অন্য মেরুতে। গেস্ট হাউস্টা কেন যে দূরে করেছে।

জামা পরতে-পরতেও কেন যে গেল না, সে তা নিজেও বুঝে পেল না। বিশাখার ছবিটা আস্তে করে উঁকি দিয়েও কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

উঃ,! সাইট থেকে ফিরতে ফিরতে কখন যে চারদিকে এমন সূচীভেদ্য অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তা তো সাংখ্যায়ন টেরই পায় নি। কিন্তু এখনও যে অনেকটা পথ চলতে বাকী!

হ্যাঁ, আজই ষষ্ঠ দিন। এখানে আসার পর দিনের হিসার কেন যে করেছে তা ভেবে সাংখ্যায়ন নিজেই হেসেছে।

কিন্তু একী, হাতের টর্চ লাইটের আলোটা নিভে গেল কেন? ব্যাটারী শেষ, বালব্ খারাপ হল না কি?

আরে, সঙ্গে সঙ্গে এ যে মুষলধারে বৃষ্টিও শুরু হল দেখছি—পালাও, পালাও সাংখ্যায়ন, বাঁচতে চাও তো এখনই পালাও, কে যেন দূর থেকে হেঁকে বলে।

কিন্তু আমার বাড়ি কোথায়? কোন্ পথ ধরে গেলে আমি

আমার বাড়িতে, আমার আশ্রয়স্থলে পৌঁছাব? কোথায় সেই পথ, কোথায়ই বা আমার তেমন অবলম্বন?

আলো কোথায়, শব্দ কোথায়? আলো, আলো; হ্যাঁ, হ্যাঁ, আলো মানে নতুন জীবন, নতুন প্রাণের আশা ভরসা, শব্দ, শব্দ-ব্রহ্ম। কিন্তু সেই শব্দই বা কোথায়···

হঠাৎ দূরে কোথায় যেন এক পাথরের চাঙড় সশব্দে ভূপতিত হল। আরে, একি আমার ঘাড়েই পড়বে না কি? ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে সরে আসে সাংখ্যায়ন।

পাহাড়তলীর বৃষ্টি সে দেখেছে। হঠাৎ করে মেঘ হয়, ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকৃতি আবার শান্ত হয়ে যায়। সে বৃষ্টি ভাল লাগে, তাকে উপভোগও করা যায়। কিন্তু এই বৃষ্টি! বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি, গলা দিয়ে যেন স্বরই বের হবে না আর। সমস্ত পৃথিবীকে যেন এক অনর্থক, অবাঞ্ছনীয় অন্ধকারে ভরিয়ে দিয়ে, জগৎ এবং জীবনকে হারিয়ে দিয়ে কী যেন এক পৈশাচিক উল্লাস অনুভব করে কী এক আনন্দে যেন তা আজ মেতে উঠতে চায়।

আমি একা, বড্ড একা, বড়ই একা মনে হয় সাংখ্যায়নের। —বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। তোমরা কে কোথায় আছ আমাকে বাঁচাও। আলো আনো, শব্দ আনো, আমি যে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে বাঁচতে চাই, আমি যে বাঁচতে চাই....

ওহো কেউ নেই, না, না, কেউ নেই। পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে শব্দগুলো যেন তাকেই ব্যঙ্গ করে ফিরে আসছে বারবার—।

একবার তারা কলেজ-হস্টেলের বন্ধুরা শিকারে গিয়ে দুটো বাঘ মেরেছিল। প্রকৃতির সেই ভীষণ দর্শন হাতিয়ারকে সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে তাদের কী আনন্দই না হয়েছিল! বন্য পশুর যন্ত্রণা, আর্তনাদ, তাদের মনে কোনও বেদনাবোধই

জাগিয়ে তুলতে পারে নি সেদিন। একটা বাঘের মাথা বেশ সুন্দর করে তারা বাঁধিয়েও রেখেছিল নিজেদের ঘরে।

কিন্তু এবার, এবার কি প্রকৃতির সেই সব হিংস্র অস্ত্রগুলি বের হয়ে আসবে? পাহাড় থেকে সাপ, বাঘ বেরিয়ে আসবে, বের হয়ে আসবে নেকড়ে, ক্রুর জিঘাংসায় ছিঁড়ে খাবে সুন্দর, সুপুরুষ সাংখ্যায়ন মিত্রকে?

অথবা আজ সেই মৃত বাঘের ক্ষুধার্ত, রুষ্ট প্রেতাত্মাই লাফ দিয়ে পড়বে নাকি তার ঘাড়ে?

একটা ছোরা, একটা কিছু হাতিয়ার, একটা —, না, না, কিছুতো সঙ্গে নেই।

কিছু নেই, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের জন্যে কোনও অস্ত্রই নেই সাংখ্যায়নের হাতে। তবে কি, তবে কি বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য সমাজের নাগরিক সাংখ্যায়ন মিত্র ফিরে যাবে সেই আদিম পৃথিবীতে? যেখানে মানুষ নগ্ন. অসভ্য, বর্বর!

কোন একটা অবলম্বনও নেই। এখন শুধু বুদ্ধি লোপ পাওয়া, চেতনা লুপ্ত হওয়া আর অন্ধকারে ডুবে যাওয়া। আমার চারিদিকে কেবল অন্ধকার, কেবল অন্ধকার। অন্ধকার, অন্ধকার।

আচ্ছা আমার নামই সাংখ্যায়ন মিত্র না-কি? না, না আমি কে? কেমন যেন এক অসহায় হাহাকারের মত শোনায় তার কণ্ঠস্বর। আমি, আমি···আমার নাম কি?

অবশ হয়ে আসে সাংখ্যায়ন। সে যেন এবার বসে পড়বে, পড়ে যাবে সে, যে কোনো জায়গাতেই। বুদ্ধি, শক্তি সব যেন লোপ পেতে চলেছে তার ...

কিন্তু ওকী ওকী, বাবুজী ··বাবুজী....ও কার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, জীবনকে কে যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসছে? কে আসছে বিপদসঙ্কুল পথে সাহায্যের আলোকবর্তিকা নিয়ে? কে.... কে.... ?

হ্যাঁ, লছমীই তাকে নিয়ে এসেছে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ফিরিয়ে দিয়েছে সাংখ্যায়ন মিত্র'র জীবন।

বাবুজীর ফিরতে দেরী দেখে সে কেমন করে বুঝতে পেরেছিল তার নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে। তাই ঘুমিয়ে পড়েও সে উঠে পড়েছে, তারপর কেমন করে দুজন দেশওয়ালী ভাই জোগাড় করে একটা খাটিয়া বাঁশে ঝুলিয়ে ঐ প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়েছে তা কেউ জানে না।

আর তাকে যত্ন করে খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যেও টর্চ ধরে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে সবাইকে।

ভাবছিল সাংখ্যায়ন এ-সব কথাই, ভাবছিল কাজ করতে করতেও।

এখানে আসার পর আজই সপ্তম দিন। এ কথা ভাবতেই একটু গম্ভীর হয়ে পড়েছিল নিজেরই অজান্তে। কালকের ঝক্কিটা কম না হলেও আজও সে কাজেই বের হয়ে পড়েছে কিন্তু লছমী বারবার মানা করেছিল বের হবার সময়। আর জলভরা চোখ নিয়ে উদাস ভাবে চেয়েছিল তার চলার পথের দিকে।

অবশ্য কালকে বৃষ্টির সময় যখন সে পথ দেখিয়ে চলেছিল তখন সাংখ্যায়ন একবার লছমীকে বলেছিল, তুমিও খাটিয়াতে বসেই চলো না।

সলজ্জ হাসিতে লছমী জবাব দিয়েছিল, নঁহী বাবুজী, সরম আতি। কিন্তু তার চোখ যেন কোন এক আনন্দের হাসিতে চিকচিক করে উঠেছিল। বৃষ্টির জলে ভেজা তার শরীরটার দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে পারে নি সাংখ্যায়ন। কিন্তু টর্চের আলোতে চুরি করে দেখতে পেয়েছে তার গাল দুটো কে যেন আরেক ছোপ লাল আবীরের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে।

তবে কি, তবে কি লছমী তাকে....? লছমীর সুন্দর কাঁচ

মুখটা কেন যে বারবার ভেসে উঠছে মনে। তবে কি, তবে কি লছমীকে সেও....?

এখানে মানুষ নেই, সুসভ্য সমাজ নেই। কোনও সভ্য সমাজের কচকচিও নেই। দুজন আদিম নর-নারী তাদের ভালবাসা দিয়ে ঘর বাঁধবে। একজন পাবে তার মনের মানুষকে, আর অন্যজন— ?

অন্যজন একটা অবলম্বন পাবে। লছমীকে অবলম্বন করে জীবন-যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া ...।

যদি একজন নারী আর একজন পুরুষ তাদের ভালবাসা দিয়ে নতুন জীবনের ঘর বাঁধতে চায়, তবে ক্ষতি কি ? না, না, কোন ক্ষতিই নেই। না, না....।

ঘুরে ফিরে এই সব কথাই পাক দিয়ে চলল সাংখ্যায়নের মাথায়।

তবে কি, তবে কি বাবুজী আমাকে পেয়ার করে ?—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বেশবাস ঠিক করে নিতে নিতে এই কথাই বারবার ঘুরে ফিরে ভাবছিল লছমী।

অসম্ভব কি ? শহরে থাকতেই তো কত দেখেছে সে। সিনেমাতেও এ-সব সে কম দেখে নি। আজকাল ওসব আর কেউ মানে না। বাবুজীরাও কত অন্য ঘরের মেয়েকে শাদী করেছে—

আর দেখতেও সে কী কম সুন্দরী, লেখাপড়াও সে কম শেখেনি তো। লছমীর মনেও আনমনা ভাবনা।

'বাবুজী আমাকে ভালবাসে' কথাটা আবার মনে পড়তেই সমস্ত শরীরটা কেমন যেন শির্ শির্ করে উঠল লছমীর। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেও যে আজ আর সাধ মিটতে চাইছে না তার। কিছুতেই শাড়ি পরাটা আজ আজ তার মনমতো হচ্ছে না।

কিন্তু বাবুজী আজও কেন এত দেরী করছে ? বাবুজী কেন বোঝে না তার কথা.... ?

লছমী ফিরে তাকাতেই সাংখ্যায়নকে দেখতে পায়। বাবুজী আপ—! নিজের আনন্দটাকে আর লুকোতে পারে না লছমী এবার।

তারপর? কেউ আর খেয়াল করতে পারেনা কি হল। সাংখ্যায়নের দৃঢ় বাহুবন্ধনে ধরা পড়ে তার বুকে মুখ লুকোয় লছমী। এক আনন্দের ঝর্ণাধারায় অবগাহন করে লছমী তার দয়িতের বুকে ভবিষ্যত জীবনের পরিকল্পনা করে চলে। আরও গভীরভাবে তাকে অবলম্বন করতে চায়।

আর সাংখ্যায়ন মিত্র... ?

হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে সাংখ্যায়ন মিত্র। কার যেন পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। কোনও সুসভ্য সমাজের মানুষ চলে এল নাকি? তারা এসে সুশিক্ষিত, মার্জিত রুচির যুবক সাংখ্যায়ন মিত্র'র এ-রূপ দেখলে কি ভাববে?

এই গেঁয়ো মেয়েটা তাকে ভালবাসে বলে তাকেও কি সমাজ, সংস্কার বিসর্জন দিয়ে সে পথেই যেতে হবে নাকি? না, না....

মাথার পেশীগুলি কেমন যেন দপ্ দপ্ করে ওঠে সাংখ্যায়নের। তাড়াতাড়ি বাহুবন্ধন শিথিল করে দেয় সে।

আর ভাল করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই সাংখ্যায়নের পায়ের ওপর অবশ হয়ে পড়ে যায় লছমী।

—হ্যাল্লো মিণ্টার মিত্র, আপনি যে আর ওদিকে গেলেনই না? ঘরে ঢুকে কপট অভিমানের সুরে ঘাড় বাঁকিয়ে বলে বিশাখা। নিজের যেটুকু রূপ আছে তাকে আরও পোশাকী করার চেষ্টা করেছে সে আজ। কসমেটিক্সের উগ্র গন্ধে আজ যেন সবাইকে সে কাছে টেনে আনবেই বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। তাই চোখ নাচিয়ে বলে, —কি হল জবাব দিচ্ছেন না যে?

না, না, মানে এই....। কৈফিয়তের সুরে বলে ওঠে সাংখ্যায়ন।

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পার্সটা বের করে একটা দশ টাকার নোট বের করে লছমীর দিকে ছুঁড়ে দেয় সে।

বড্ড nasty এরা, কেন যে এদের সাহায্য করে প্রশ্রয় দেন— বিশাখা কেমন যেন বাঁকিয়েই বলে কথাটা।

না, না, মানে এই ...। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে সাংখ্যায়ন আর কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে। —চলুন চলুন কোথায় যাবেন, অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে পালাবার জন্যে কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে হয়ে ওঠে সাংখ্যায়ন।

হ্যাঁ চলুন, এখনও বেশ বেলা আছে। ঐ টাইগার হিলের কাছ থেকেই একটু ঘুরে আসা যাক।

আর কথা না বাড়িয়ে সাংখ্যায়ন বিশাখার হাত ধরে চট্‌পট্‌ বের হয়ে এল ঘর থেকে....।

এদিকে সব হারিয়ে অভিভূতের মতো পড়ে থাকে লছমী। একটা অব্যক্ত কান্না তার বুক ঠেলে যেন বের হয়ে আসতে চায়। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে টাকাটা ঠেলে সরিয়ে নিল সে—

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বেশবাস ঠিক করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল লছমী। আর একটু হেসে টাকাটা কুড়িয়ে নিয়ে সে ভেতরের দিকে পা বাড়াল—

তার ঘরের কাজ তখনও কিছু বাকী ছিল।

ফুলের অন্য রঙ

॥ ১ ॥

একটু আগেই রবি চলে গেল। রবি আমার ছাত্র। শুধু স্কুলের নয় আমি ওকে বাড়িতেও পড়াতাম। অবশ্য ফ্রীতে। পড়াশোনায় ছেলেটি ভাল ছিল। দরকার ছিল। একটু ধরিয়ে দেওয়া। আমি শুধু সেটুকুই করেছি। কিন্তু তাতেই রবি আমাকে আজও পুজো করে আসছে। ওর ভাল-মন্দ কিছু হ'লে তার সবটুকু যতক্ষণ আমাকে না-জানাচ্ছে ততক্ষণ যেন তার শান্তি নেই! মাঝেমধ্যে এখানে ওখানে টুকুটাকু দু-চারটে কাজকর্ম জোটালেও পার্মানেণ্ট কিছু একটা জোগাড় করতে পারে নি। এতদিন এরকমই চলছিল। কিন্তু হঠাৎই খবর দিয়ে গেল ওর বোধহয় স্থায়ী একটাকিছু হয়ে যাবে। যাবার আগে একমুখ হেসে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছি। এই-তো সেদিনের কথা সেসব। অথচ তারপর আজই আবার চলে এল সে। মাঝে কোনও খবরই পাইনি। অনেক কিছু বলে গেল। কেমন যেন এক উত্তেজনা, এক উদ্বেগ ছড়িয়ে ছিল তার চোখে মুখে। অবশ্য হাসি মুখ দেখিয়ে প্রাণপণে চাপা দেবার চেষ্টা করছিল মুখের সে-ই খবর। আমি কিন্তু কিছু বুঝতে দেইনি ওকে। যদিও ব্যাপারটা ধরেছি ঠিকই।

আসলে ওর সব ব্যাপারটাই এখন এতো গোলমেলে যে বলার নয়। নিজের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে গেলে অনেক কিছুই বোধহয় বাদ পড়ে যাবে। তাই ওর ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে গেলে রবি যেভাবে সবকিছু বলেছে আমাকে, তাই মনে করাই ভাল।

··তপু বলল, রবিদা, আপনাকে যে খুব একটা, আই মীন কেমন যেন একটু উতলা দেখাচ্ছে। আরে অত ঘাবড়ে যাবেন না। কোথায় আপনি আমাকে একটু সাহস টাহস দেবেন, তা নয় আপনি নিজেই ভয় পেয়ে যাচ্ছেন। বেটার আপনি একটু রিলাক্স্ করুন। ব্যাস্ ব্যাস্ এইতো বেশ। এবার ঠিক আছে। নিন্ একটা ড্রিঙ্কস্ নিন। শুনুন এবার আপনাকে বুঝিয়ে বলি। আসলে আপনি যেরকম চুপ মেরে গেছেন তাতে তো মনে হচ্ছে যে শেষ অবধি আমাকেই বক্‌বক্ করে যেতে হবে। কিন্তু জানেন তো আমার টেপ রেকর্ডার একবার বাজতে শুরু করলে চট করে থামতে চায় না যে! না, না আপনি যদি আপত্তি না করেন তবে আমার আর বলার কি থাকে? এবার আসুন না একটু গুছিয়ে বসি। শুনুন যেখানে যাচ্ছি সে জায়গা আপনার অপরিচিত হলেও খারাপ লাগবে না। তাছাড়া বেশি কিছু অসুবিধাও নেই সেখানে যেতে।

অনেকটা কথা একনাগাড়ে বলে তপু থেমেছিল। একটু চুপ করেও থাকল কিছু সময়। তারপর ঘাড়টায় একটু চুলকে বলল ··রবিদা, একটা কথা বলব? আমি বললাম—বলোনা কি বলবে? আমার নিজের কথাগুলোও আমার নিজের কানেই কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। আসলে আমার ভেতরটা তখনও ধুক্‌পুক্ করছিল! কে যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে তখনও। তপু আমার দিকে ভাল করে তাকালও না। আমার কথা শুনে একটু মুচকি হাসল কেবল। বলল—থ্যাঙ্কস্! আসলে জানেন গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে আমার। চা-তে গলা ভিজল না। সিগারেট খেতে চাই। ওর কথা শুনে আমি একটু স্বস্তি পেলাম। একটু হাসার চেষ্টা করলাম। বললাম—ঠিক আছে। তবে বেশি খেও না। ও'ও হেসে দিল। সিগারেট ধরিয়ে রিঙ্গ্ ছাড়তে ছাড়তে বলল—না, না দুটোর বেশি কিছুতেই নয়। বলেই তার যেন হুঁশ এল—

আরে দেখুন, দেখুন! কী বলতে বলতে কোথায় চলে এসেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, যা বলছিলাম। দেখুন হাওড়া স্টেশন থেকে নাইন আপের বরকাকানা কোচে চেপে বসলেই আপনি নিশ্চিন্ত। আর ভাববার চিন্তা করবার কিছু নেই। ভোররাতেই গাড়ি পেঁছে যাবে গোমো জংশনে। ব্যাস্ এবার বরকা কোচটা কেটে নিয়ে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে জুড়ে দেওয়া হবে। নিন্ কফি খান একটু। রাতে খাওয়াটা একটু হেভিই হয়েছে। গরম কিছু খেলে ভাল লাগবে। ফ্লাস্‌ক্ থেকে কফি ঢালল তপু। আমি আর না বলার সুযোগই পাইনি।

তপু তার কথা তখনও শেষ করে নি। একটু ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল আমার। কিন্তু শেষ কথা না শোনা পর্যন্ত আমার ভেতরের অস্থির ভাবটা কিছুতেই কাটবে না।

তপু সিগারেট শেষ করেছিল এরই মধ্যে। এবার কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল—হ্যাঁ এখানে এসে যদি শান্টিং এর আওয়াজে আপনার ঘুম ভেঙ্গে যায় তবে মন খারাপ করবেন না। কেননা পথে যেতে যেতে আপনিও অনেক মূল্যবান সম্পদ কুড়িয়ে নিতে পারবেন। এটুকু বলেই তপু হেসে দিল। কথায় কথায় ওর এতো হাসি। হাসি-রোগ আছে না-কি ওর? আমি ভাবলাম! অবশ্য এ-ও তো হ'তে পারে যে হেসে হেসেই ও কোনও ব্যাপার গোপন করতে চাইছে। যাক, তপু বলছিল—আসলে এখানকার পথঘাট গাছপালা সবকিছুরই কেমন যেন এক অদ্ভুত আকর্ষণ—আপনিও অজান্তেই অনুভব করবেন। চন্দ্রপুরা থার্ম্যাল প্ল্যাণ্টের চিমনী আপনি দূর থেকে এক সময় দেখে নিতে পারবেন। দেখে নিতে পারবেন গোমিয়ার এক্‌স্‌প্লোসিভ্ ফ্যাকটরিকেও। বোকারো স্টেশন এলে চাইকী আপনি প্ল্যাটফর্মে নেমে একটু পায়চারিও করে আসতে পারেন। দেখতে পাবেন দু'দল লোক চলেছে দু'দিকে—কেউ যাচ্ছে স্টিল প্ল্যাণ্টের দিকে, কেউ বা থার্ম্যাল্ প্ল্যাণ্টের পথে।

—কিন্তু সত্যি বলছি, তপু কথা বলছিল, গোমিয়া আর

ডোনিয়া দুই জায়গায় একই দিকের দুই আইডেনটিকাল পাহাড় দেখে খুব অবাক হয়ে যাবেন আপনি। 'অবাক'—বলে তপু এমন একটা মুখের ভাব করল যে আমি আর না হেসে পারলাম না। আমাকে হাসতে দেখে তপুও হেসে ফেলল। বলল—রবিদা, সত্যি বলছি রাঁচী রোড্ স্টেশন আসলে আপনার নিশ্চয়ই খুব ইচ্ছে হবে অ্যাটাচিটা নিয়ে ওখানেই নেমে পড়ি। ঘুরেই আসি একবার রাঁচী থেকে। তা আপনি যাই ভাবুন না কেন আমি কিন্তু তাহ'লে আপনাকে ছাড়বনা কিছুতেই। বলব দাদা, কষ্ট করে যখন এতটা এসেই পড়েছি বাড়ি পৌঁছাতে আর কতক্ষণ? না, না অন্য কোথাও যাওয়া-টাওয়া আর হবে না এখন। ঘড়ি ধরে বসে থাকুন। এখ্খুনি পৌঁছে যাব।

ততক্ষণে তপু ছেলেটাকে আমার খুব অদ্ভুত ঠেকেছে। সারা রাস্তাই বোধহয় এরকম বকর বকর করতে করতেই যাবে। তবে ছেলেটা বোধহয় তেমন খারাপ হবে না। অবশ্য ওর সম্পর্কে যা শুনেছি তার কোনওটাই ভাল নয়। কিন্তু ছেলেটা সারারাত কথা বলতে বলতে এল। ভাগ্যি দু'জনের একটা ক্যুপে ছিলাম নাহলে তো অন্য যাত্রীরা গালমন্দ করত আমাদের।

ভোর হ'তে দেখি গাড়ি এসে একজায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। ভোররাতের দিকে একটু ঝিমুনীর মতো এসেছিল আমার। যাহোক্ আমি উঠে দেখি তপু তখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে। বেচারী! সারাপথ কথা বলা! কিন্তু উপায় নেই। এখানকার কিছুই আমার চেনা-জানা নয়। বাধ্য হয়েই ওকে ডাকলাম—তপু তপু! ক'বার ডাকতে হ'ল, শেষে আল্তো করে একটু ধাক্কা দিতেই তপু চোখ কচ্লে উঠে বসল। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর বলল—চলুন চলুন নেমে পড়া যাক্ এবার। আমরা বরকা এসে গিয়েছি। চলুন এই কোচটা ছেড়ে আমরা অন্য কম্পার্টমেণ্টে উঠি। আমাদের বগিটা এখানেই কেটে রাখবে।

আমিতো ওর কথা শুনে তাড়াহুড়ো নেমে এলাম। দেখি তপু এরই মধ্যে স্টেশনের ট্যাপওয়াটারে হাতমুখ ধুয়ে ফেলেছে। মুখটুখ মুছে একেবারে ফ্রেশ। বলল—দাদা চলুন। কিছু একটু পেটে দিয়ে নি। স্টেশনের বাইরে খুব ভাল কচুরি আর সিঙ্গাড়া করে। গরম গরম খেতে ভালই লাগবে। তারপর চা-ও খেতে হবে। বাইরে একটু ঠাণ্ডা লাগছে। মাফলারটা বেশ করে জড়িয়ে নিল গলায়। আমায় বলল—রবিদা ফুলহাতা সোয়েটার বের করে পরে নিন্ এবার। আমি বললাম—না, তার দরকার নেই আমার। রোদ উঠছে। তা' এবার সত্যি করে বলোতো তোমার পিসির বাড়ি আর কতদূর ?

আমার ব্যস্ততা দেখে তপুও যেন একটু তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করল। মনে হ'ল ট্রেনে উঠলেই হল আর কী! ওঠ আর নেমে পড়। তপু অবশ্য মুখে বলল—এখানে একটু দেরি হলেও আপনি কিন্তু মন খারাপ করবেন না। বরকাকানার পর ভুরকুণ্ডা পোঁছাতে আর ক-মিনিট। তারপর এখানে পোঁছালে পতরাতু-তো দেখাই যায়!

তপু এমনভাবে বলছিল যে মনে হ'ল আমরা বোধ হয় ওর পিসির বাড়িতে পোঁছেই গিয়েছি। কিন্তু সত্যি সত্যিই দেখলাম পতরাতু স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ি আর তপু লাফ দিয়ে নেমে পড়েছে নিচু প্ল্যাটফর্মে—'আসুন আসুন নেমে পড়ুন, আমরা পোঁছে গিয়েছি'। চেঁচিয়ে ডাকল ও। প্রথম দেখাতে আপনার নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগছে না ? আমার থেকে জবাব না নিয়েই তপু চলে গেল লাইন পেরিয়ে। কাকে যেন ডাকল—বাসু, ও বাসু! আমরা এদিকে। এসো মালপত্রগুলো নিয়ে যাও। মাঝবয়সী একজন লোক এগিয়ে এল। প্যাণ্ট শার্ট পরা। ওপরে একটা সোয়েটার। বাসু এগিয়ে এসে নমস্কার করে দাঁড়াল। তপু বলল—রবিদা, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেই। ইনি হচ্ছেন

বাসুবাবু। পিসি ও পিসেমশাই-র রাইটহ্যাণ্ড। আসুন গাড়িতে গিয়ে বসি। পথে যেতে যেতে এ জায়গা সম্বন্ধে আপনাকে আরও দু-চার কথা বলব। রেল লাইন থেকে আমরা অনেকটা উঠে এসেছি, দেখেছেন বোধহয়। স্টেশনের কাছে এপাশে যে রেল-কলোনী তার নাম স্টীম কলোনী। ঐ যে ওদিকে দূরে দেখুন স্টীম ইঞ্জিন মেরামতির জন্যে বিরাট বিরাট শেড্ রয়েছে। ওকে বলে স্টীম শেড্।

আমি বলেছি—জায়গাটা বেশ ভালই তো মনে হচ্ছে।

আমার কথা শুনে খুশি হ'ল তপু—আচ্ছা, আচ্ছা। আপনার বেশ ভাল লাগতে শুরু করেছে, তাই না? ঐ যে দূরে, যে কোয়ার্টারগুলি আর একটা পাহাড়ের ওপর তৈরি বলে মনে হচ্ছে, ওটা হ'ল ডিজেল কলোনী। আমরা ওখানেই যাব।

তপু একনাগাড়ে কথা বলছিল। আমি এদিক্ ওদিক্ দেখছিলাম। এই তো দেখতে না-দেখতেই দু' কিলোমিটার পথ চলে এলাম। আসলে জানেন, এখানে এই কমিউনিকেশনই বড় অসুবিধার। বড় ভরসা ট্যাক্সি, ক'জনের অবশ্য সাইকেল, প্রাইভেট কার রয়েছে আর নয় তো পায়ে হেঁটেই যেতে হবে।

আমি একটু বাধা দিলাম কথার মধ্যে। তপু বলল—ওহো, কি বললেন? আমাদের ঐ রেলগাড়িটা কোথায় যাবে শেষ পর্যন্ত? দাঁড়ান দাঁড়ান একটু ভেবেনি। তপু যেন কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর বলে—পতরাতুর পর পড়বে হেন্দগীর কোলে রায়। এর মধ্যে পতরাতু হেন্দগীর কোলে হাজারীবাগ জেলায়। কিন্তু রায় পড়েছে রাঁচী জেলায়। রায়ের পরে খেলারী, তাও রাঁচী জেলায়। খেলারীর নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। ওখানে এক বিরাট সিমেণ্ট ফ্যাক্টরি রয়েছে। এসব ছাড়িয়ে টোরি ম্যাকলোস্কিগঞ্জ, নিন্দা ছাড়িয়ে ছিপাদোহর। টোরির হাট বিখ্যাত। আর ম্যাকলোস্কিগঞ্জের পেয়ারা খাওয়াব আপনাকে সময় করে। এইসব

স্টেশনের নাম হিন্দি ইংরাজির সঙ্গে বাংলাতেও লেখা। তারপর লাতেহার ডালটনগঞ্জ রাঝোয়ারা বারওয়াডি ছাড়িয়ে গারওয়া রোড এসে পৌঁছাবে গাড়ি। স্থানীয় লোক জায়গাটাকে বলে রেহেলা। এখান থেকে রেললাইন চলে গিয়েছে ডিহিরী-অন্-শোনের দিকে। ওদিকে না গিয়ে এ গাড়ি অন্য লাইন ধরে গারওয়া মেরাল গ্রাম রমনা হয়ে পৌঁছে যাবে চোপান।

কথা বলা শেষ হবার আগেই গাড়ি থেমে যায়। তপু কথা শেষ করে। বলে—ব্যাস্ ব্যাস্ আসুন আমরা পৌঁছে গেছি। এই আমার পিসেমশাই-র কোয়াটার। পিসে এখন ডিউটিতে। পিসিমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। এই দেখুন এখন সবে বেলা এগারোটা।

রবি বলল—পতরাতু-তে এসে উঠলাম এভাবেই। কিন্তু ট্রেন জার্নি'র একটা ধকল ছিলই, তার ওপর মনের চাপও ছিল বেশ। তাই ভালমন্দ একটু খেয়ে বিছানায় শুতে না শুতেই ক্লান্তিতে চোখ বুজে এসেছে আমার।

তপুর ডাকে বিকালে ঘুম ভাঙ্গল আমার—কি ব্যাপার, ভালো তো? দুপুরে ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি নিশ্চয়ই। আসলে জানেন এই পাহাড়তলীতে সবচেয়ে ভাল যে জিনিসটা পাবেন তা হচ্ছে হাওয়া। অবশ্য খাওয়ার খুব একটা যে সুবিধা নেই তা-তো বুঝতেই পারছেন। ঐ মাঝে মাঝে মাছ আসে ভুরকুণ্ডা থেকে এখানকার বাজারে। নাহ'লে তরিতরকারী যা জোটে এখানকার হাটে তা আর বলার নয়।

বিকালে চায়ের টেবিলেই আলাপ হ'ল তপুর পিসের সঙ্গে। রবি বলেছে। ভদ্রলোক গম্ভীর সুপুরুষ। ছেলেমেয়ে নেই কাছে। দু'জনেই হস্টেলে থেকে পড়ছে। তপু মাঝে মধ্যে এলে পিসি পিসের কাছে থেকে যায়। ওরা ক'দিন থাকতে পারে জেনে ভদ্রলোক বললেন—তপুর বাবার টেলি পেয়েছি। কালই। তা' বেশ! এসেছ যখন একটু এপাশ ওপাশ ঘোরাঘুরি করে দেখেই

যাও। বাঙালী কেন যে বোকার মতো কোলকাতা কোলকাতা করে চেঁচায় বুঝে উঠতেই পারি না। রাবিশ্!

ওঁর সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে তপুর সঙ্গেই ঘুরতে বের হলাম। তপু বলতে বলতে চলছিল—আমাদের কোয়ার্টারের পেছনে পায়ে চলার যে রাস্তা চলে গিয়েছে ঐ পথ দিয়েই কিন্তু আমাদের যেতে হবে। দেখবেন, আপনি তো কোলকাতার ছেলে, ভয় পাবেন না যেন। আসলে এই রাস্তাটা বড় বিশ্রি। মাঝে মাঝে কাঁটা-ঝোপ, এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা, আর বড়ো নির্জন। ভয় লাগার কথা।

জানেন, আপনাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি আমি? তপু জানতে চায়। জবাবের অপেক্ষা না করেই বলে—শুনলে কিন্তু সত্যিই আপনার খুব ভাল লাগবে। ছোটবেলার অনেক কথা মনেও পড়ে যেতে পারে। বিদ্যাসাগরমশাইয়ের সে-ই নদী সাঁতার দিয়ে পার হবার গল্প।

আরে ব্যাস্ ব্যাস—আপনি ঠিক ধরেছেন। ঐ যে দূরে নীল প্রান্তসীমায় রূপালী ফিতের মতো যে রেখাটা দেখা যাচ্ছে তা আসলে দামোদর নদ। রাজরাপ্পা থেকে বের হয়ে দামোদর এপথও অতিক্রম করেছে।

না, না খুব বেশি দূর নয়—বাড়ি থেকে জোর এক-দেড় কিলোমিটার হবে। এই তো, আরে এই তো এসে পড়েছি।

দেখতে পাচ্ছেন? ঐ যে ঐ চিহ্নটা, ঐ দাগটা। বর্ষার সময় নদী ওখান অবধি চলে আসে। কিন্তু এখন? এখন সমস্ত জায়গাটাই কেবল বালি আর বালি! চারদিকে শুধু বালি আর বালি! দূরে—দেখছেন—মাঝখান দিয়ে জল কিন্তু বেশ তিরতির করে বয়ে চলেছে।

আসুন না, আরে আসুনই না, আমরা একটু জলের কাছাকাছিই চলে যাই। - এই এই—আরে দাদা সাবধানে পা ফেলুন। না, না

লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমিই হেসে ফেলে ভীষণ অন্যায় করে ফেলেছি। মাপ চাইছি। প্লীজ আমাকে এবারের মতো একটু ক্ষমা ঘেন্না করে দিন। আরে আমিও তো ওরকম বালির মধ্যে পা ডুবিয়ে দিতে পারি। কিন্তু কোথায় চোরাবালি আছে কে জানে? আমাদের তো সাবধানে পা ফেলে চলতে হবে। তাই না? কি বলেন?

দেখুন দেখুন—এদিকে তাকান একটু। দেখেছেন নদীর জল কেমন স্বচ্ছ আর কী সুন্দর! মাইরি বলছি কবি হ'লে আমিও নিশ্চয়ই কবিতা টবিতা লিখতে টিখতে বসে যেতাম—কাক-স্বচ্ছসলিলা—না দূর ছাই! না মশাই আমাদের মতো নীরস লোকের ওসব হবে-টবে না। তারচে' বরঞ্চ আকাশ দেখি, গাছ-পালা দেখি, বাতাসের গন্ধ শুঁকি—বেশ হবে। ঐ যে ওপারের বন, ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে অনেক অনেক দূরের ঐ পাহাড়গুলি কী সুন্দর লাগছে, তাই না?

বারে! পলিমাটি কী সুন্দর লাগছে দেখেছেন? এম্-মা আপনি পা' দিয়ে দিয়ে ওগুলো ভাঙ্গতে বসেছেন কেন? খুব মজার খেলা পেয়ে গিয়েছেন—না? দাঁড়ান দাঁড়ান—আমিও—।

আচ্ছা আ-চ্-ছা ঠিক আছে আমিই বরঞ্চ ঐ পাথরটার ওপর বসে জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে থাকি। বেশ হবে। আরে আপনার চোখেমুখে অত ভয় ভয় ভাব ফুটে উঠছে কেন? ভয় নেই দাদা ভয় নেই—ডুবেবো না। অত সহজে ডুবছি না।

কি হল আবার আপনার? ক'জন লোকের গলার আওয়াজ পাচ্ছেন আপনি? তাতেও ভয়? না, না ভয় নেই। ভয় করবেন না। আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন তো। আমি-ই বরঞ্চ ছুটে গিয়ে ওদের সঙ্গে একটু বাত্‌চিত করে নেই কেমন?

হ্যালো হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন আমি কি বলছি? কি বললেন? আপনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন? ওরা বলল এই নদী পার হয়ে

ঐ বনের ওপাশে ওদের গাঁয়ে চলেছে।....দেখতে পাচ্ছেন? দেখছেন ওরা কেমন নদীর মাঝখান দিয়ে ছপ্ ছপ্ করে জল ঠেলে ঠেলে হেঁটে চলেছে, আমাকে কিন্তু ওরা সাবধান করে দিল। এখানে জলে খুব ঘূর্ণি রয়েছে। একবার পড়লে তলিয়ে যেতে কতক্ষণ? জানেন এই সময়টাতেই ওরা না-কি এখান দিয়ে যায়, জলের মধ্যের পথও ঠিক্ ঠিক্ খুঁজে নেয়। কিন্তু বর্ষায় বড় কষ্ট হয় ওদের।

দেখলেন ওদের সঙ্গে কথা বলে কত কিছু জানা গেল। আচ্ছা এবার কিন্তু উঠতে হয় আমাদের। দেখুন নদী আর পাহাড়কে কাছে রেখে সূর্যাস্ত সত্যি খুব সুন্দর লাগে। চলুন আর দেরি নয়, সন্ধ্যা নেমেছে। এখানকার রাত কিন্তু বড় ভয়ঙ্কর। বুঝতে পারছেন বুনো পাখির আওয়াজেও কেমন গা শিরশির করে ওঠে? ঘুঘু-র ডাকেও মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়, তাই না?

॥ ২ ॥

পরদিন সকালে উঠেও তপুর সে-ই একই বক্‌বকানি শুরু হ'ল। মাথা ধরার যোগাড়! কিন্তু কি করব? আমার যে তখন আর পেছনে ফেরার পথ নেই।···রবি বলছিল, দ্বিতীয় দিনের অভিজ্ঞতা। তপু যখন বলা শুরু করে তখন অন্য কাউকেই কথা বলতে দেয় না। একনাগাড়ে বলে চলে। তপু বলল—হ্যাললো স্যার? কি ব্যাপার? একরাত পেরোতে না-পেরোতেই আপনাকে যে বেশ সতেজ, আই মীন ফ্রেশ, দেখাচ্ছে। যাই বলুন, হাজারীবাগের জল-হাওয়ার কিন্তু খুব সুনাম রয়েছে। বেশি দিন নয়—একমাস। একটা মাস এখানে থেকে যান—দেখবেন বাড়িতে পাড়ায় কেউ আপনাকে চিনতে-ই পারবে না।

যাকগে যাকগে, ওসব ভেবে এখন আর দরকার নেই বেশি খাওয়া বেশি বেশি হজম হওয়া—নাঃ সে সব ভাল কথা নয়। কোলকাতার যা হাল—জল হাওয়া খাওয়া! একটা কিছু বদল দরকার। কি

বলেন ? খুব তাড়াতাড়িই বদলাতে হবে। যাকগে ওসব কথা এখন টেনে এনে দিনটাকে মার্ডার করার কোনও দরকার নেই।

তারচে' চলুন না আজ একবার কয়লা তোলার জায়গা দেখে আসি। এখানে কাছেপিঠে ও-রকম অনেক জায়গা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। অনেক জায়গায় আট দশ হাত মাটি খুঁড়লেই না-কি কয়লা পাওয়া যায়! অবশ্য ওসব দেখতে যদি আপনার উৎসাহ না থাকে তবে—তবে চলুন না দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে পতরাতু থার্মাল পাওয়ার স্টেশন পিটিপিএস্ থেকেই ঘুরে আসি।

চলুন আমাদের প্রোগ্র্যামটা ঠিক করে ফেলি। রেল স্টেশন পেরিয়ে আমরা প্রথমে পতরাতু বাজার দেখে নেব। নামেই বাজার। আসলে এখানে কিস্সু পাওয়া যায় না। আর যাওবা পাওয়া যায় তার দাম নেবে গলা কেটে। আমি যদি মানুষ মারি ভাই আমার হবে জেল আর এরাও মানুষ মেরেই ভাই পয়সা করল ঢের। হুউম না-না হুম। একটু গেয়েই ফেললাম। কিছু মনে করলেন না-তো ? এখানে কজন বাঙালীর অবশ্য স্টেশনারী দোকান-টোকান রয়েছে। তারচে' চলুননা একদিন সবাই মিলে রামগড় গিয়ে হৈচৈ করে আসা যাবে, বাজারটাজারও হবে। চাইকী সিনেমাও দেখা যাবে। এখানে তো আর পিক্চার টিক্চার নেই।

দেখুন দেখুন! হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ঐযে বাজারের ওদিক্টা দেখছেন—ওটাই মেন রোড। ওখানে মিনিট দশ-পনের দাঁড়ালে বাস পেয়ে যাব। ভাড়াও বেশি নয়, পঁচিশ পয়সা মাত্র। ক'মিনিটের মধ্যেই পিটি পিএস পৌঁছে যাব।

কি বললেন ? বাসে আপনার ভাল লাগবে না ? দশ মিনিট! আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে আপনাকে তবে আর জোর করব না। ট্যাক্সিই নেই কি বলেন ? পাঁচটাকা লাগবে কিন্তু। তবে যদি অন্য যাত্রী—আই মীন দশ বারো জন প্যাসেঞ্জার নিলে মাথাপিছু ভাড়া নেবে পঞ্চাশ পয়সা।

দেখুন দাদা, আপনাকে আগে থাকতেই একটা কথা বলে নিই। আমরা কিন্তু প্রথমেই পিটি পিএস যাব না। ও জায়গাটা যদিও এখান থেকে মোটামুটি তিন কিলোমিটারের মতো কিন্তু আমরা যাব ওখান থেকে আরও তিন কিলোমিটার দূরের দেহাতী গাঁ সিমলাটাঁরায়। তাহলেই আমরা পেঁৗছে যাব হেসলাতে। ওখানে কিন্তু বেশ কিছুটা পথ হাঁটতে হবে আমাদের। তারপর আমরা নীলগাড়া নদীর বাঁধের ওপর উঠে আসব। নীলগাড়া এসেছে দূরের পাহাড় থেকে। দেখবেন কী রুদ্ধ আক্রোশে নদীর জল যে বাঁধের ওপর আছড়ে পড়ছে তা বলার নয়। দেখলে ভয় লাগে। কখন যে বাধা ভেঙ্গে ফেলে। আমরাও একদিন এরকম কত বাধাই না ভেঙ্গে ফেলতে পারি! কিন্তু জানেন চারপাশের দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে আপনার। চারপাশে পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। আর তারই মধ্যে সবুজ ঘাসের দেশে লাল সুরকীর পথ আপনার খুব ভাল লাগবে। দূর থেকে থার্মাল প্ল্যান্টের ছড়ান ছবিও লাগবে বেশ। এই বাঁধের জল যাবে ভুরকুণ্ডায়—খাবার জল চাই যে ওদের। আর থার্মাল প্ল্যান্টের জলের সবটাই যায় এখান থেকেই।

এসব দেখা হ'লে আমরা প্ল্যান্টে যাব। ভেতরে যাবার পারমিশান পেতে কোনও ঝামেলা হবেনা। ঢুকে প্রথমেই ডানদিকের চারটে ওয়াটার কুলিং টাওয়ার দেখে আপনিও আশ্চর্য হয়ে যাবেন। যেন প্রচণ্ড বৃষ্টির ফোঁটার থেকেও বেশি জোরে জল পড়ছে ওখানে। জানেন আরও কত কিছু দেখার জিনিস আছে ওখানে? বারবার দেখেও আমার আবার দেখতে ইচ্ছে করে। গরমজল বাষ্পাকারে কেমন করে বের হয়ে আসছে, কত জল নোংরা বলে খারাপ বলে ফেলে দিচ্ছে। দেখব বুলডোজার দিয়ে কয়লার বিরাট বিরাট চাঁইকে পিষে পাউডার করে দিচ্ছে, মাটির নিচের পথ দিয়ে কয়লা পাঠাচ্ছে। তারপর? তারপর কন্ট্রোল রুম ভাল করে দেখে নিয়ে তবেই বাড়ি ফেরা আমাদের।

॥ ৩ ॥

সেদিনের বেড়ানোটা খুব ভাল লেগেছিল। রাশিয়ানদের সহযোগিতায় কী বিশাল কাজই না হয়েছে, হচ্ছে, হবেও। টাউনশিপ অন্যধারে। রাস্তার নাম রোড ওয়ান টু থ্রি এইরকম করে করে। আর এরকম করে তপুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তপুর কাছে কাছে থাকা। ওকে চোখের আড়াল করা চলবে না কিছুতেই। আমার ওপর ওরকমই আদেশ। জানি না কেন?

রবি তার কথা আমাকে বলে চলেছিল...প্রতিদিনই তপুর সঙ্গে বের হওয়া, তার কথা শোনা।

—জিজ্ঞাসা করছেন আমাদের বাড়ির সামনের দিকে দূরের ঐ শেড্‌টা কিসের? আরে ছি ছি—দেখেছেন কী লজ্জার কথা! আপনাকে ওটার সম্বন্ধেই কিছু জানাইনি এতদিন। ওটা হ'ল ডিজেল শেড্‌। ওখানে রেলের ডিজেল ইঞ্জিন সারাই ঝাড়াই বাছাই হয়। এই সব কোয়ার্টার তো ওখানকার ওয়ার্কারদের জন্যেই। চলুননা এখনওতো বেশ বেলা রয়েছে, আজ ওদিক থেকেই না হয় ঘুরে আসা যাক্‌। তবে একটা কথা বলি—আপনি কিন্তু রাগ করতে পারবেন না। রিপেয়ার ওভারহলিং—ওসবের কী-ই বা বুঝব আমরা? বরঞ্চ লাইনের ওপারের গাঁ থেকেই ঘুরে আসি। কোনওদিনও যাওয়া হয়নি ওদিকে। যদিও নাম শুনেছি। গাঁয়ের নাম সাকুল। আর ওর যে অংশটা, মানে টোলা, রেললাইনের ধারে তার নাম বরওয়া। এ গাঁয়ে নাকী দেখার মতো কিছু নেই। কিছু যদি দেখতে হয় তবে যেতে হবে তিন চার কিলোমিটার দূরের কিরিগাড়া গাঁয়ে।

আরে দাঁড়ান দাঁড়ান। একটু আস্তে চলুন। বাব্বাঃ কে বলবে যে আপনি কোলকাতার ছেলে? এই ক'দিন এখানে থেকেই যে একেবারে খাস দেহাতী হয়ে পড়েছেন। কোই বাত নহি। চলিয়ে চলিয়ে।

জানেন রেললাইন এখানে খুব বাঁক নিয়েছে। তারপর অনেকটা পথ সোজা গেলেও এখানকার রাস্তা বড় খারাপ।

আরে আপনার তো ঠিক নজরে পড়েছে দূরের শালগাছ। কী সুন্দর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। তাই না? শালপ্রাংশু মহাভুজ। হা হা হা! দেখুন ওটাই কিরিগাড়া। অর্ধেক মাটি অর্ধেক বালির জমিতেও কেমন চাষ হচ্ছে। এ মাটি চানা মটর মকাই বাদাম চাষের পক্ষে যাকে বলে দি বেস্ট।

এখানকার বাড়ি ঘরদোর সব পুরনো ভাঙাচোরা—এরা যে বড় গরীব। ছত্রীবংশীয় লোকই বেশি এ গাঁয়ে। কাহার কুর্মী-ও রয়েছে। মুণ্ডা রয়েছে সাঁওতালও রয়েছে। ওঁরাওদের আপনি কিন্তু বেশি দেখতে পাবেন না। তবে জাতপাতের সমস্যা তেমন না-কি নেই। গরীবের আবার জাত?

এই-তো এসে গেছি আমরা। আসুননা, আরে আসুনই না। গাঁয়ের মধ্যেই চলে যাই। কোলকাতার ভদ্দর লোকদের দেখে ওরা কেমন অবাক হয়ে যাবে? অবাক! অবাক!

অবাক কাণ্ড! ওরকম উৎসাহ করে গ্রামে ঢুকতে গিয়েও তপু ছিট্‌কে বেরিয়ে এল? দারুণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল ওকে। আমার হাত ধরে একেবারে টানতে টানতে নিয়ে এল। লাইনের ওপর দিয়ে দৌড়াতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ি আর কী!

॥ ৪ ॥

সেদিন রাতে রবি যা যা ভেবেছিল তাই বলেছিল আমাকে। রবির কথাগুলো আমার কানে বাজছে এখনও—

....আমি নিজেও জানিনা ঠিক কিভাবে আমি এইসব ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম? মাত্রই তো দিন সাতেক হ'ল কোলকাতা ছেড়েছি। অথচ মনে হচ্ছে যেন কতদিন কেটে গিয়েছে। সব যেন সত্যিই

অদ্ভুত মনে হয়। এখানে চাকরীতে জয়েন করার ঠিক পনের দিনের মাথায় আমার ডাক পড়ল খোদ মালিকের খাসকামরায়।

তপু এখন পাশের ঘরে বোধহয় অঘোরে ঘুমাচ্ছে। অথচ আমি জানি আজও রাতে আমার ঘুম হবে না, হতে পারে না। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা। মাথার মধ্যে সমস্ত ব্যাপার কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে! এখানে আসবার ক'দিন আগেও আমি ছিলাম বেকার। দরখাস্ত পাঠিয়ে পাঠিয়ে হয়রান। চাকরি পাবার কোনও আশাই ছিল না। তবুও কেমন করে যেন এখানে চাকরী হয়ে গেল একটা।

বাবার-ই এক ছেলেবেলার বন্ধু। বাবা-র সঙ্গে তার সেদিন হঠাৎই দেখা। ব্যাস্ আর কি? তারই দৌলতে হয়ে গেল। নাহ'লে প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টারের সংসার? কোথায় ভেসে যাচ্ছিল। দাদা-মামার জোর না থাকলে কিছু হয়? যেদিন প্রথম কাজে যাই সেদিন মা ঠাকুরের পুজোর ফুল ছোঁয়ালেন মাথায়। ছোট ভাই-বোনদুটোর মুখে এক উজ্জ্বল হাসি! বাবা চুপচাপ থাকেন। সেদিনও কিছু বলেন নি। ভেবেছিলেন—বাড়ির দুঃখ বোধহয় ঘুচবে এবার।

এতদূরে এসে বাড়ির কথা মা-বাবা ভাই-বোনের কথা খুব বেশি করে মনে পড়ে। আমার ভরসায় ওরা কত আশা করেই না বুক বেঁধেছেন। আমাদের বাড়িটা বড় অদ্ভূত জায়গায়। এখানে সাইকেল রিক্সা চলে আবার হাতে টানা রিক্সাও চলে। খাস্ কোলকাতায় তো সাইকেল রিক্সা বারণ। মানে আমরা হচ্ছি ধোবীকা গাধা, না ঘরকা না ঘাট্কা। অথবা দু জায়গারই। বালীগঞ্জ রেল স্টেশন পেরিয়ে বি বি চাটার্জী রোড ধরে বেনের মাঠের পাশ দিয়ে ডান দিকে একটু মোড় ঘুরলেই ব্যাস্ আমাদের পাড়া আমাদের বাড়িতে এসে যাবেন। ভীড় ধাক্কাধাক্কি.সব কিছুর বাইরে।

চাকরী পেয়ে বাঁচলাম। ক'জায়গায় পার্ট টাইম কাজ করেছি। সেলস্‌ম্যানেরও। কিন্তু এখানে একেবারে হাতে হাতে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার!

অফিসে রোজ আসি যাই, মন দিয়ে কাজ করি, কাজ শেখার চেষ্টা করি। ছোট্ট ফার্ম। তবুও নানা রকম বিজনেস্‌ করে—স্টিলের আলমারি তৈরি থেকে শুরু করে একদিকে অফিসের চেয়ার টেবিল সাপ্লাই আবার অন্যদিকে মোটর সারাই-র কারখানা বা স্কুল কলেজের প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাশের রকমারি মেটেরিয়ালস্‌ সরবরাহ করা। নানান ধরনের লোকের আনাগোনা তাই সব সময়ই লেগে আছে। সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যেত! বেশ লাগত। ভালই লাগত কাজ করতে।

তা কথা নেই বার্তা নেই এক দিন ডাক এসে হাজির। এরকম ঘটনা অফিসের ইতিহাসে আর না-কি ঘটেনি। খোদ মালিকের ডাক। তার চেম্বারে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। —বড়া' সাহাব সালাম দিয়া!

আমিতো তাজ্জব! সেন সাহেব কেন ডেকে পাঠাবেন? যা রাশভারী লোক! স্বনামে বেনামে কত ব্যবসাই না আছে। তাছাড়া পলিটিক্যাল কানেক্‌শনস্‌-ও রয়েছে। আমার তো শুনেই গলা শুকিয়ে গেল।

কিন্তু দেরি করার কি উপায় আছে? অথচ, তিনি আমাকে এত যত্ন আত্তি করলেন বলারই নয়। বুঝতেই পারলাম না। বাবার বন্ধুর সঙ্গে তার এত হৃদ্যতা হয়েছিল কিভাবে? সেন সাহেব আমাকে নির্মল বাবুর ভাইপো বলেই জেনে এসেছেন দেখলাম। একথা-সেকথার পর তিনি বললেন একটু বাইরে পাঠাতে চান আমাকে। জরুরী দরকার। যতদিন কাজ না মেটে আমাকে সেখানেই থাকতে হবে। খাওয়া থাকার খরচের জন্যে ভাবনা কোম্পানীর। বাড়িতে মাইনের টাকা ঠিক ঠিক পৌঁছে যাবে।

তাছাড়া হাত খরচের জন্যে আমাকে আগাম হাজার টাকা দিলেন। আমিতো হতবাক্। হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। কাজটা কি? গার্জিয়ান-টিউটরের। সেন সাহেবের ছেলেকে একটু আগলে আগলে রাখা।

টাকার অঙ্ক, সুবিধা, কাজের ধরণ সব দেখে শুনে আমি বেশ চমকেই গিয়েছিলাম। আমার ভয়টা হয়তো চোখে পড়েছিল সেন সাহেবের। কিন্তু বাইরে সেকথা প্রকাশ করলেন না তিনি।

আর সেদিনই হাওড়া স্টেশনে তপুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা পরিচয়। অবশ্য ওর সম্বন্ধে অফিসে দুচার কথা শুনেছিলাম। দেখে বেশ স্মার্ট মনে হ'ল। এবারই বি. এস-সি ফাইনাল। বেশ দিলখোলা। তবে কেমন যেন চঞ্চল স্বভাব ছেলেটার। এখানে আসার পর থেকেই ওর সঙ্গে চরকীবাজির মতো ঘুরতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু না করব কি করে? ওটাইতো আমার এখনকার কাজ। ওর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে আমি হাঁপিয়ে উঠলেও ছেলেটাকে একটুও ক্লান্ত হতে দেখিনি আমি। ভাবছিলাম এরকম ক'দিন চললেই হয়েছে! এই রকম চাকুরীর চেয়ে··· ? কিন্তু টাকা? মা-বাবা ভাই-বোন—তাছাড়া নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা? আর অন্য কিছু ভাবতেই পারিনি।

অথচ দু'দিন আগে সে-ই কিরিগাড়া গাঁ থেকে বলতে গেলে একরকম পালিয়ে আসার পর সেই যে ঘরে ঢুকেছে তপু ব্যাস্ আর বাড়ির বের হবার কথা মুখে আনছেই না। ওখানে কী যেন দেখে হঠাৎ ও ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সমস্ত মুখটা মড়ার মুখের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল এক মুহূর্তেই। ভীষণ এক অজানা আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠল ও।

বুঝতে পারছি এসবের মধ্যে কোনও এক গভীর রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। ছেলেটা কিন্তু তারপর থেকেই কেমন যেন শুকিয়ে গিয়েছে। কি যে হ'ল? ওর নিকট আত্মীয়দের সঙ্গেও এ ব্যাপারে

কথা বলা আমার পক্ষে খুব একটা সুবিধের হবে বলে মনে হল না। তপুকেই সুবিধামত জিজ্ঞাসা করতে হবে। জানতে হবে। না হ'লে কালকের মত পরের রাতেও আমার ঘুম আসবে না।

॥ ৫ ॥

এরপর রবি বলেছিল তপুর সঙ্গে তার ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক কথাবার্তার বিষয়ে। তপু একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। দিন দু'য়েক পরে সেদিনই সে প্রথম ঘরের বাইরে এল। বলল—আমি জানি আর বুঝতেও পারছিলাম যে ঠিক আজই আপনার এই প্রশ্নের মুখোমুখি আমাকে দাঁড়াতে হবে। তবে আপনি যে রকম সঙ্কোচের সঙ্গে অত্যন্ত সন্তর্পণে ওকথা জিজ্ঞাসা করলেন তা না করলেও হয়তো চলতো। কাল অনেক রাত পর্যন্ত আপনার ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছি। তখনই অনুমান করেছি কোনও একটা সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেয়ে আপনি খুব চিন্তায় রয়েছেন।

আসলে আমিও এক চিন্তায় ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েছি একদিনেই। বাইরে যতই ফ্রী দেখানোর চেষ্টা করিনা কেন ঘটে-যাওয়া সব ঘটনা মনের ওপর সিনেমার ছবির মতো একের পর এক এসে খুব তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যাচ্ছিল।

অথচ পাড়ায় ফিরে গিয়ে সব কথা খুলে বলাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার বাবার মান সম্মান তাছাড়া....তাছাড়া আমার ভবিষ্যৎ জীবনের আশা স্বপ্ন ইয়ংম্যানের—না, না সে সব আমি পারব না। পারব না।

দেখছেন আমি কাঁদছি। আগে আমার চোখ দিয়ে জল বের হয়নি। ওদের কষ্ট দেখে আমি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছি। আমাদের লীডাররা বলেছেন এরাই হচ্ছে সমাজের আসল শত্রু। এদের ওপর নির্ভর করেই ঐসব লোকেরা শোষণ চালাচ্ছে।

—কিন্তু তপন্, ওকথা থাক্। আশা করি, তুমি এমন কিছু করনি যাতে তোমায় পালিয়ে বেড়াতে হবে?—রবি বলে, আমি তপুর পিঠে হাত রেখে বলি।

—না, না আপনি জানেন না। লীডাররা বললেন ওদের খতম কর প্রথমে। সমাজ-শোষণ মুক্তির পথে তাই হবে প্রথম ধাপ।

—ওতে কার কি লাভ হ'ল ভাই? রবি নাকি হতবাক হয়ে জানতে চেয়েছে।

—জানি না। ওরা বললেন বৃটিশদের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে থানা আক্রমণ পুলিশকে বোমা মারা কতরকম কাজই না করেছেন বিপ্লবীরা। তাতে করে বৃটিশ ভয় পেয়েছে।

—তাই কি? তুমি কি জানো না ওরকম বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টায় দেশের কত অসামান্য প্রতিভাই না অকালে ঝরে গেছেন? তুমি নিশ্চয়ই খেলাধুলা করেছ? কোচদের প্রথম কাজ হচ্ছে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের নাড়ি নক্ষত্র খোঁজ করা, খেলার মাঠের পরিবেশ জানা, তারপর দেখা দরকার কেমন করে বিপক্ষের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। আবার দেখ লীডাররা নিজেরা সেফ্-পজিশন থেকে ছেলে ছোকরাদের এগিয়ে দেয়। তারা জানেও না কোন্ পথে আক্রমণ আসবে? প্রয়োজন মতো লড়াইয়ে পিছু হটে আসবার পথ কোন্টা?

—তাতে কি হ'ল? সাম্রাজ্যবাদী শক্তি—

—থাক্ থাক্। দেশের মানুষই কত সময় বিপ্লবীদের বিপক্ষে গিয়েছে তা তুমি নিশ্চয়ই জান?

—ওরা বিশ্বাসঘাতক। দেশের শত্রু জাতির শত্রু। পা-চাটা খয়েরখাঁ-র দল।

—দাঁড়াও। দাঁড়াও ভাই, অত উত্তেজিত হতে নেই। তুমি একবার ভেবে দ্যাখোতো এতবড়ো দেশে এত মত এত পথের এদেশে এক জায়গায় বৃটিশ সিংহকে বিব্রত করে কিছু ফললাভ হয়েছিল

কি ? না-কি আহত সিংহ তীব্র আক্রোশে তার প্রতিশোধ স্পৃহা আরও বাড়িয়ে তুলেছিল ?

—ওসব বুঝি না। অতশত ভেবে লাভ নেই। লীডার-রা বললেন, মারো। আমরা মারলাম। কে মরল তা-কি দেখতে গেলে চলে সব সময় ?

—একি কথা! তুমি নিজে যখন মারবে তখন কি ভাববে না কে মরল ? একজন লোক মরলে কেউ একজন বাবা হারাবে ছেলে হারাবে স্বামী হারাবে ?

—এসব আপনি আবার কি তত্ত্বকথা শুরু করলেন ?

—তুমি নিজেকে ভালবাস ?

—হ্যাঁ।

—তবে অন্য-কে কেন ভালবাসতে পার না ? যে নিজেকে ভালবাসে সে অন্যকেও ভালবাসবে। যে নিজে মরতে চায় না সে অন্যকেও মারতে চাইবে না।

—অথচ আমাদের লীডাররা যে বললেন শোষণ-মুক্তির ওটাই প্রথম, প্রধান ও একমাত্র পথ। আন্দোলন জোরদার করতে হবে। সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

—ওসব কথা আমারও মাথায় ভাল ঢোকে না। তবে গান্ধীজীকে দ্যাখো। তিনি বুঝলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ওরকম এখানে-ওখানে খোঁচাখুচি করে তেমন কোনও লাভ বোধহয় হবার নয়। দেশের সবাইকেই সঙ্গে নিতে হবে পরাধীনতার ওই শিকল ভাঙ্গতে। দেশ জুড়ে আন্দোলন চাই। সবাই কি বন্দুক ধরতে জানে চালাতে জানে ? না। তবে ? তবে সবার হাতে এমন অস্ত্র তুলে দাও যা সব্বাই ব্যবহার করতে পারবে।

—আপনার কথাগুলো নতুন ঠেকছে।

—বেশ বেশ, ভাল। সুখী হলাম শুনে। এবার যদি বলি তোমাদের কোনও লিডার বিশ বছর বাদে স্বীকার করে বিবৃতি

দিচ্ছেন যে এইসব খুনোখুনি করে আমরা ভুল পথে চলেছিলাম তবে কেমন হবে ? কে দেবে তবে ঐ মৃত্যুর হিসাব ?

—তা কি করে সম্ভব ? না, না এসব কি কথা বলছেন আপনি ?

—পৃথিবীতে সবই সম্ভব। তুমি নিজেও একদিন বুঝবে তুমিও হয়তো ভুল করেই ···।

—কি বললেন আপনি ? ভুল ! আমি ভুল করেছি ? জগদেবের ছেলেটাকে....?

কথা বলতে বলতে তপু কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। বেচারী ! তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে তপু যা বলেছিল সংক্ষেপ করলে তা অনেকটা এই রকম দাঁড়ায়—

....আসলে আপনি নতুন মানুষ। না হ'লে এসব জ্ঞানের কথা আপনি আমাকে বলতেন না। তাছাড়া বাবাকেও আপনি হয়তো এখনও পুরোপুরি চিনে উঠতে পারেননি। আর আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় হ'ল কোথায় ? সেদিন হাওড়া স্টেশনেই আমাদের প্রথম দেখা। কিন্তু বুঝেছি আপনি আমায় কিছুতেই ছাড়তে চাইছেন না। ব্রেন ওয়াশ করার জন্যে বোধহয় আপনি আমার পিছন পিছন লেগে রয়েছেন। কিন্তু দেখলাম ওসব কিছু নয়। আমাকে সঙ্গ দেওয়াই আপনার একমাত্র কাজ।

....আচ্ছা আমাদের বাড়ি কোথায় ? সে খবর তো আপনি পেয়েছেন ? দমদম ক্যান্টনমেণ্ট স্টেশনে নেমে নলতা-য় যাব বললেই যে কেউ পথ দেখিয়ে দেবে। সেখানে আমার বাবাকে এক ডাকে সবাই চেনে। অবশ্য আমাকে বাড়িতে খুঁজতে গেলে কোনও লাভই হবে না আপনার। আমাকে পেতে হ'লে সোজা গজাদার চায়ের দোকানে চলে আসবেন।

আমাদের ক'বন্ধুকে ওখানেই খুঁজে পেলেন লিডাররা। ব্যাস্ আর কি ? আমরাও ভিড়ে গেলাম। গোপন মিটিং, ট্রেনিং, লেক্চার প্র্যাকটিশ্—সব তাতেই হাজির থাকতে হ'ত।

ক'দিন পর পল্টু এসে খবর দিল টিকটিকি লেগেছে আমাদের পিছনে। ওদের হেল্প করছে জগদেবের ছেলে। ব্যাস্ ওপর থেকে আদেশ এল ওকেই খতম করতে হবে প্রথমে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ে গঞ্জে শহরে নগরে পথে ঘাটে ছড়িয়ে দিতে হবে বিপ্লবের বাণী। দরকার হলে আমাদের ঐ সব শত্রুদের শেষ করে দিতে হবে। জনসাধারণের মনে ভয় ঢোকাতে হবে। শাসকদল তাদের রক্ষা করতে পারবে না এই চিন্তা এই ভীতি তাদের মধ্যে ছড়াতে হবে। সমস্ত দেশ জুড়ে সম্ভব না হলেও অনেক জায়গাই আমাদের দখলে চলে আসবে।

...বুঝলাম, ঠিক কথা। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। কাজটা আমাকে একাই করতে হবে। আমি-ই না-কি উপযুক্ত লোক একাজের জন্যে। তবে কাজটা করতে হবে দিনের আলোয় অনেক লোকের মাঝখানে। একটা প্যানিক সৃষ্টি হবে তাতে। শ্লোগান দিতে দিতে সরে পড়তে হবে। কিছু বোমা-টোমাও ছোঁড়া হবে।

বেচারী জগদেবের ছেলে! পনের-ষোল বছরের উঠ্‌তি ছোকরা। বাজারের মধ্যে তার ওপর পাইপ গানের গুলি চালিয়ে দিলাম। বোমাও ফেললাম। ধর্ ধর্....কিন্তু আমার সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? গাড়িতে করে সট্‌কে পড়লাম।

এরপরই শুরু হ'ল আসল খেলা। গোপন আস্তানায় বসে খবর পেলাম আমাদের বাড়ি আর আমার যে সব ঠেক ছিল সবজায়গায় পুলিশ হানা দিয়েছে।

ওদিকে আমার বাবা-ও কিন্তু বসেছিলেন না। জগদেবকে ডেকেছেন। কথা বলছেন। শেয়ালদ'র কাছে এক হাসপাতালের সামনে খাটিয়া বিক্রি করে সে। দেশে জরু বালবাচ্চা রয়েছে। এই ছেলেটা সেয়ানা হয়েছে বলে নিজের কাছে এনেছিল। তা' যত লোক মরে জগদেবের তত লাভ। খাটিয়ার বিক্রি বাড়ে। বাবা ওকে দশ হাজার টাকা ধরিয়ে দিলেন। দেশে চলে যাও—খেতি

বাড়ি কর। এদিকে আসবে না। বলেই বাবা রিভলভার বের করেছিলেন।

ব্যাস্‌ সেতো সেদিন-ই হাওয়া!

এবার আমাকে নিয়ে পড়লেন বাবা। আপনাকেও চাকরির লোভ দেখিয়ে জাল ফেলে ধরা হয়েছে। কানে এসেছে কথাটা। আর কি? রাতের ট্রেনেই আমরা পগার পার।

কিন্তু এই কিরিগাড়াতেই যে সে-ই জগদেবের বাড়ি তা আমিই বা জানব কি করে? সে তো জানে আমি তার ছেলেকে খুন করেছি। নিজের আস্তানায় পেলে সে-কি আমায় জ্যান্ত ছেড়ে দেবে?

—তবেই দ্যাখো তুমিও নিজেকে ভালবাস! মরতে ভয় পাও। সবকথা শুনে তপু চুপ করে ছিল অনেকক্ষণ। রবি পরেও বলেছে একথা।

—ব্যাপারটা সেদিক থেকে ভেবে দেখতে গেলে অনেকটা ঠিক বটে।

—আচ্ছা এরকম হাঙ্গামা করে তবে কার লাভ হয়?

—জানি না। বুঝতে পারি না।—অসহিষ্ণু জবাব তপুর।

—একটা সাধারণ লোকের স্বপ্ন তো ভেঙ্গে গেল তোমার ভুল কাজের জন্যে? অবশ্য যদি তুমি এ কাজটাকে ভুল বলে মনে কর। বলোতো কার ঘরে সন্ত্রাস সৃষ্টি হল?

—এ প্রশ্নর জবাব আমি আজ দেবনা! হয়তো আপনি নিজেও একদিন একথার জবাব খুঁজে পেয়ে যাবেন।

—আচ্ছা ঠিক আছে। চলো। অন্ধকার হয়ে আসছে। তবে বুঝতে পারছি এখনও বেশ কিছুদিন তোমাকে এখানে এভাবেই বাড়িতে থাকতে হবে। তুমি নিজেই নিজের সৃষ্টি করা আতঙ্কে ভুগছ।

তপু আর কথা বাড়ায়নি। খুব অনিচ্ছার সঙ্গে আমার হাত

ধরে বাড়ি ফেরে সে। ভীষণ ক্লান্ত বিধ্বস্ত। হেরে যাওয়া এক মানুষ যেন!

তবে ওকে চাঙ্গা করে তুলতে রবির বেশিদিন লাগেনি। খুব চালাক আর বুদ্ধিমান ছেলে সে। তাছাড়া জীবনের বাঁচার লড়াই রবি আর তার বাড়ির লোকেরাও তো কম করেনি। আর একটু আধটু পড়াশোনাও করেছে ও'।

॥ ৬ ॥

আর একটু আগেই রবি চলে গেল। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ছিল ও। সব কথা একে একে খুলে বলেছে আমার কাছে। সেন সাহেবের বিশ্বাস কীভাবে অর্জন করেছে সে। তপুর ঝামেলাও এর মধ্যে ম্যানেজ করেছেন সেন সাহেব। তপুকেও কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন ।

আমি রবি-র যাবার পথের দিকে তাকিয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। কয়েকমাস আগেও ও ছিল রবি বোস, এখন হয়েছে মিঃ রোবি বাসু। এছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিলনা সেন সাহেবের! একমাত্র ছেলের ব্যাপারে অনেক ঝামেলা আর অনেক অশান্তি পোয়াতে হয়েছে তাঁকে। রবিকে তপুর কাছে কাছে রাখার ব্যবস্থা করে ফেললেন তিনি-ই! তাই রবিকে কেরানী থেকে একলাফে জুনিয়ার এক্সিকিউটিভ্ করে দিলেন।

যাহোক্ রবির উন্নতিতে আমিও ভারী সুখী হয়েছি। ওকে অনেকদিন থেকেই দেখছি। মাষ্টার মশাইকে এতটা শ্রদ্ধা আর ভক্তি কাউকেই বড় একটা করতে দেখিনি। ও আরও বড় হোক্ এই আমি চাই।

অবশ্য একটা কথা রবি জানে না। আমি কিন্তু জানি যে

বছরের একটা সময় পালামৌ আর হাজারীবাগ জেলায় একরকম গাছের কালো কুঁড়ি ফুটে বের হয়ে আসে ফুল। সে ফুলের রঙ্ কি? অনেকেই হয়তো জানেন না। বা জেনেও খেয়াল করেন না। দেখেও মনে রাখেন না। কিন্তু আমি নজর করেছি, আমি জানি।

বছরের একটা সময় পালামৌ আর হাজারীবাগ জেলায় একরকম ফুল ফুটে গাছের তলায় পড়ে থাকে। গাছে থাকলে সে-ই ফুলের রঙে আকাশের রঙ্ বদলে যায়। সেই কালো কুঁড়ির ফুলের রঙ্ লাল। মনে হয় আকাশ লালে লাল। পড়ে থাকা ফুলে মাটির রঙ্ও যায় লালে লাল হয়ে—রক্তে রাঙা লালে লাল! টাকার রঙ্ও কালো না হয়ে কখনও কখনও লাল হয়ে যায়। রক্তের থেকেও সেই রঙ আরও গাঢ় লাল! সেন সাহেবরা তা ভাল করেই জানেন।

সরমা

ভুল ? হ্যাঁ, ভুলই তো। আবারও সেই একই ভুল করে বসলেন তিনি। কেন যে এই একই ঘটনা ঘটতে দিলেন। ভাবতে গেলেই মন মেজাজ কিছুই আর ঠিক রাখা যায় না। অথচ ঘটনাতো ঘটেই মানুষের জীবনে। আসলে এইসব ঘটনা আর দুর্ঘটনা নিয়েই তো জীবন। ভুল থেকেই তো ঘটনা ঘটে, দুর্ঘটনাও ঘটে যায়।

হাতের সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছিল। এবার একটা শেষ টান দিয়ে ফেলে দিলেন ঘোষ সাহেব। অবশ্য এতক্ষণ তিনি সাহেব ছিলেন না। বাসে একটা সাইড-সিট পেয়েছিলেন। চলার পথে চোখ ছিল বাইরে। দেখছিলেন। ভেতরে নজর করেননি তেমন। কিন্তু মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন ঐ অফিসের সাহেব সাহেব মেজাজটা আবারও ফিরে এল। না হলে এতক্ষণ তো বেশ আসছিলেন। ভাবলেন। ভাবতে গিয়েই মনে হ'ল কি-যে একটা উদ্ভট খেয়াল হ'ল তাঁর ! বলেই দিলেন—না, ঠিক আছে জগ, তোমার বাড়িতে আমি ট্রেনে নয় বাসে করেই যাব। একটু পথঘাটও দেখাটেখা হবে। লোকজনও জানা হবে। জানা চেনাও তো দরকার আশপাশের দুনিয়াকে। কি বল ?

কি আর বলবে জগ। কিছুই জবাব দিতে পারেনি। বড় খেয়ালী তার সাহেব। অফিস থেকে বের হয়ে গেলেন কোনও এক দিন। অনেক বাদে ফিরলেন একগাদা কেনাকাটা করে। এরকম কত ঘটনা তো সে জানে সাহেবের। তাই সে কেবল হাত কচলে বলেছে, হুজুরের যেমন মর্জি। আর কিছু বলেনি জগ। বলতে পারেনি। কিন্তু কথা বাড়াতে চায়নি সে। আসলে সাহেব না যাওয়াতে বাড়ির অনুষ্ঠান কেমন যেন সাদামাটা ঠেকেছে তার

নিজেরই কাছে। মানসিক পুজোর দিন বড় সাহেব না থাকাতে খুব মন খারাপ হয়েছিল জগর। অথচ রাগ করতে পারেনি। কেন না সে তো জানে তার মা-বাপ মরা ছোট ভাইটাকে বাঁচিয়ে এনেছেন হুজুর আর বৌ সরমা। গাঁয়ের ক'ঘর আর অফিসের প্রায় সবাই এসেছিল প্রসাদ পেতে। কিন্তু জগ হতাশ হয়ে গিয়েছিল হুজুর কথা দিয়েও আসতে না পারায়। অথচ কত ইচ্ছে ছিল সর-কে হুজুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। বলবে—হুজুরের পায়ের ধুলো মুখে দে। খা।

তা' কপাল মন্দ! হবে আর কী! তা যাক বড় মানুষের শখ। বড় সাহেব বলেছেন এই ছুটির দিন আসবেন। তা' আসুন না। তিনি বাসেই আসুন। জগ মনে মনে ভাবে।

আবারও হাত কচলে বলেছে—সাহেব আপনার ইচ্ছের ওপর কথা বলা কি আমার সাজে?

ঘোষ সাহেব কথা শুনে হেসেছেন। কিছু বলেননি। কিন্তু সেই ইচ্ছের ফেরেই যে এমন ভুগতে হবে তা' কে জানত? বেশ চেপেই বসেছিলেন বাস টার্মিনাস থেকে। নিজের গাড়ি নেননি। তাছাড়া মাঝপথ থেকে না উঠে ওখানে গিয়ে পছন্দসই সিটে বসেছেন। তারপর গড়িয়া-বোরাল-ত্রিপুরেশ্বরী কালীমন্দির হয়ে নতুন হাট ঘুরে কোদালিয়া পেছনে ফেলে সোনারপুর স্টেশনে এক চক্কর মেরে হতাশ ঘোষ সাহেবকে সাউথ গড়িয়ায় এনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল সেই বাস।

তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। সন্ধে হব হব। জায়গাটা অবশ্য ঘোষ সাহেবের কাছে একদম নতুন নয়। আর নতুন নয় বলেই জগকে বলতে পেরেছিলেন একটু দেখা-টেখাও হবে। কিন্তু সেসবতো কবেকার কথা। মনেই পড়ে না যেন।

আসলে কলেজ লাইফে ফিল্মস্টার দুর্গাদাসের নাতি দেবুর সঙ্গে দাদুর বাড়ি দেখতে এসেছিলেন বন্ধুরা মিলে। সেই বাড়ির

এখন কী দশা! সব ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গিয়েছে শরিকদের মধ্যে। অথচ আগে কী রমরমাই না ছিল!—এখানে পুরোদস্তুর রেল স্টেশন করতে হবে। বললেন যেন কে। ব্যাস্ দেবুরই এক জ্ঞাতি দাদু ফ্ল্যাগ স্টেশনের সব যাত্রীর হয়ে দিনের পর দিন টিকিট কেটে দিলেন। আর যাবে কোথায় রেল কোম্পানি? কালিকাপুর স্টেশন হয়ে গেল তো সেই থেকেই।

সে সব কত কথা! কত স্মৃতি! বাড়ির ছাদে উঠে দূরে বিদ্যাধরী খাল দেখিয়ে দিয়েছিল দেবু। গল্প করেছিল, জমিদার বাড়ি থেকে ঐ খালের নিচ দিয়ে এক সুড়ঙ্গ চলে গিয়েছে একেবারে বারুইপুরের চৌধুরীবাড়ি।

এসব পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছিলেন ঘোষ সাহেব। সাউথ গড়িয়া যদুনাথ বিদ্যামন্দির ছাড়িয়ে পলিটিক্যাল সাফারারদের নিবাস পিছনে রেখে হাঁটছিলেন তিনি।

কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন। মনে পড়ল। রেল লাইন পেরিয়েই যেতে হবে তার বাড়িতে।

সাবধানে লাইন পেরোলেন। ওদিকে কিন্তু তিনি যাননি কোনোদিনই। গুমটি ঘরের কাছে একটা স্তম্ভ চোখে পড়ল। এগিয়ে গেলেন সেদিকে। দেখলেন তাতে লেখা—

ঐতিহাসিক লবন আইন অমান্য আন্দোলন স্মরণে
এইখানেই ইং ১৯৩০ সালের ৩১শে মার্চ লবন আইন
অমান্য করা হয়।

এই ফলকটা বোধহয় নতুন লাগান হয়েছে। আগে চোখে পড়েনি ঘোষ সাহেবের। সামনে কাউকে পেলেনও না যে জিজ্ঞাসা করে সঠিক কিছু জানবেন। কেমন যেন আনমনা হয়ে যান। কী যেন ভাবেন। হাতের সিগারেটটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর একটা ধরিয়ে টান দিলেন। —কেউ কথা রাখে না—। বিড় বিড় করে কী সব যেন বললেন ঘোষ সাহেব।

কথাতো তিনিও রাখেননি। মনে রাখতে পারেননি। নাহলে ভাবনাকে যে কথা দিয়েছিলেন তা কি তিনি রেখেছেন? না রাখতে পেরেছেন? কিন্তু কেন রাখবেন? ভাবনা তার কে? ভাবনার মতো মেয়েকে কথা দিয়ে কথা রাখতে গেলে তো ঘোষ সাহেবের জীবন আর জীবন থাকতো না। সে তো সাধারণ ভেতো বাঙালীর মতো এলেবেলে হয়ে যেতো।

না, ভাবনার ভাবনা চিন্তা ঝেড়ে ফেলা দরকার। তারপর কত মেয়েমানুষই তো এসেছে তাঁর জীবনে। কিন্তু ভাবনা যে কেন এখনও তাঁকে এতো হার্ট করে বলার নয়।

আসলে ভাবনার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা সাধারণত রাস্তার মেয়েমানুষদের থাকে না।

ভাবনাই বলেছিল সেকথা।

কিন্তু ভাবনার জীবনটা বা কি গেল? ঘোষ সাহেব ভাবতে গিয়েও যেন একটু থমকে দাঁড়ান। কপালে ঘামের উপস্থিতি টের পান। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছে ফেলেন।

হাতঘড়িতে সময় দেখে নেন। শীতের বেলা পড়ে এসেছে। বোধ হয় আরও একটু পথ যেতে হবে। জগ যে রকম বলেছিল সেভাবে মিলিয়ে নিলেন। বিদ্যাধরী খালের ওপর ব্রীজ পেরিয়েছেন। জামালহাটি পেছনে ফেলে যারদা অঞ্চলে চলে এসেছেন। তারপর বানিয়াবহু গ্রামও কখন যেন অজান্তেই পেরিয়েছেন। চলতে চলতে ডানদিকের পুকুর মসজিদ আবারও পুকুর এভাবে দেখতে দেখতে চলেছেন। পুকুরে কটা রাজহাঁস সাঁতার কাটছিল তখনও। ওদের মালিক তাড়া দিয়েও তুলতে পারছে না। বাঁদিকে চোখ যেতেই থমকে দাঁড়ালেন ঘোষ সাহেব। চশমাটা একটু ঠিক করে নিলেন। বাড়ির নাম পড়ে অবাক, 'সাগ্নিক'। এটা তো মুসলমানপাড়া। ভাবলেন তিনি। অবশ্য কথাটা আগেই বলেছিল জগ। কিন্তু বাড়ির লোক সম্বন্ধে চুপ থেকেছে। কোনও কথাই জানায়নি আগে থেকে। শুধু

বলেছিল ডানদিকের 'মাতৃস্মৃতি' বাড়িটা পেরিয়ে গেলে সামনেই চোখে পড়বে ডাক্তারবাবুর বিরাট দোতলা বাড়ি 'এলাহি ভবন'। ভবনকে ডানদিকে রেখে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে দু-চার মিনিট হাঁটলেই জগর বাড়ি।

বেশ লাগছে। কেমন যেন অদ্ভুত এক আকর্ষণ ছড়িয়ে রয়েছে জায়গাটায়, ঘোষ সাহেব একটু আস্তে হাঁটা শুরু করলেন। দু-চারজন পথচলতি লোক অপরিচিত একজনকে একঝলক দেখে যে যার নিজের কাজে চলেছিল।

ঘোষ সাহেবের বড় ভাল লাগছিল। ভাবলেন এই জীবন আর এই সময়কে যদি আরও একটু বেশি সময় ধরে রাখতে পারতেন!

কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব? তাই যদি সম্ভব হবে তবে ভাবনাকে কেন নিজের কাছে আটকে রাখতে পারলেন না? কেন এত বাধা এসে জড়িয়ে ধরল তাঁকে? ভাবনাতো চেয়েই ছিল ঘোষ সাহেবের কেনা দাসী হয়ে থাকতে। অথচ ঘোষ সাহেব পারলেন না কিছু করতে! একথা মুখফুটে স্বীকার করতে—জানাতেও সঙ্কোচ হচ্ছিল তাঁর।

—তবে? ভাবনা আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সেদিন। ঘোষ সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে ছিল সে। কিন্তু তার কথার কোনও জবাব দিতে পারেননি তিনি।

আসলে ভাবনার সঙ্গে তার পরিচয় তো আর বেশীদিনের নয়।

অবশ্য সেটাও ঠিক কথা নয়। কেন না ওখানে গেলে ওদের কাছে থাকলে জগৎ জীবন মানুষ সমাজ সব পরিচিত লোককেও কেমন যেন অজানা বোধ হয়। অপরিচিত ঠেকে। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব যেন একাকার হয়ে যায়। সেদিক থেকে বিচার করে দেখতে গেলে বলতে হয় ভাবনার সঙ্গে এ-জীবনেও তাঁর পরিচয় হোক এরকম একটা পরিকল্পনা যেন আগে থেকেই কারো ঠিক করা ছিল।

নাহলে তাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম তো ছিল অন্যরকম। কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে সে আর তনু সিনেমা দেখে যাবে তনুদের বাড়ি। বেহালার পর্ণশ্রী-তে। ঐ কাজিপাড়ায় সারদা বিদ্যাপীঠের কাছেই। এর আগেও ক'বার গিয়েছে সে। তারপর ভবানীপুরে নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসবে পিনু।

কিন্তু সেদিন কলেজ থেকে বের হয়েছে কী হয়নি আশেপাশে এক অস্বাভাবিক নীরবতা চোখে পড়ল। চারদিক থমথম করছে যেন। তারা দু'জনে দু'জনের দিকে তাকাল। কলকাতার গণ্ডগোল তখনও এমন কিছু বেশি হয়নি যাতে করে তাদের অন্য কিছু ভাবতে হবে। অথচ তারা চোখে চোখে কথা বলে শেষ করার আগেই ক'জন ছেলে দৌড়ে গেল। হঠাৎ করে বৌবাজারের মোড়ে সাদা ধোঁয়া উড়ল। মনে হ'ল ক'টা বোম পড়েছে। বোম পড়ল আরও ক'টা। ব্যাস ওটুকু সিগন্যালই ছিল যথেষ্ট। তারা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল। পেছনে ফিরে তাকাবার সাহস নেই আর।

এবার বোঝা গেল পুলিশ ভ্যান এসে দাঁড়াল। দুড়দাড় শব্দ। লাফিয়ে নামছে। সময় নষ্ট না করে তারা টিয়ার গ্যাস চার্জও করে দিল। ওরা দেয়ালের গা ঘেঁষে সরে দাঁড়াল। কিন্তু দৌড়ে পালাতেও ভয়। যদি পুলিশ তাদের ওপরেই গুলি চালিয়ে দেয়? পুলিশের বুট জুতোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। অনেক যেন দৌড়ে আসছে। মনে হল খুব কাছে এসে পড়েছে। ওরা তখন আর কিছু ভাবতে পারেনি। বড় রাস্তা থেকে পালাতে হবে। একথা মাথায় ঢুকতেই সামনে যে গলি পেল তাতেই দিল পা চালিয়ে।

এ রাস্তায় সে কিন্তু আগে কখনও আসে নি। কিন্তু জায়গাটা তনুর অপরিচিত নয়। বোঝা গেল। বোঝা গেল তার হাত ধরে এ-গলি সে-গলি হয়ে একটা বাড়ির সামনে এসে দরজায় টুকটুক

আওয়াজ করা দেখে। ভেতর থেকে এক মাঝবয়সী মহিলার গলার আওয়াজ এল—কে ? কাকে চাই ?

—বেণু ? বেণু আছে ? ....তনু কেমন সহজভাবে জানতে চাইল।

ঘোষ সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়েছিল বাড়িটার দিকে। তাকিয়ে দেখছিল তার প্রিয় বন্ধু তনুকেও। তনুকে সে যেন নতুনভাবে চিনল। যেন আবিষ্কার করল তাকে। অথচ তার নিজের বুকের ধুকপুকুনি তখনও কাটেনি।

তার ঘোর কাটবার আগেই দরজা খুলে গেল। একজন মাঝবয়সী মহিলা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে। মাথায় ঘোমটা। কপালে লাল টিপ। এক গাল হেসে ফেলল তনুকে দেখে। যেন কতকালের চেনা। তার ডান হাত ধরে বলল—বেণু নেই। তাতে কি হয়েছে ? আমি তো আছি। আমাকে দিয়ে কি চলবে না ?

তনু কথার জবাব দিল না। আস্তে করে চোখ টিপে পাশে তার বন্ধুকে দেখিয়ে দিল। চোখে চোখে কী যে ইশারা হয়ে গেল তাদের। পিনু-র চোখে কিন্তু এড়াল না এসব। তবে সে কিছু বুঝে উঠবার আগেই মহিলাটি এসে তার গাল টিপে দিয়েছে। তার কোমরে এক হাত রেখে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে দোতলায়। এর আগে কোনও মহিলা পিনুর সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করেনি। এ কি অসভ্যতা ? ভাবল সে। ওদিকে ভেতরে ঘাম দিচ্ছে। তার বুকের ধুকপুকুনি আবারও যেন শুরু হয়ে যাবে। একটু কান পেতে শুনতে চাইল সে—পুলিশের বুটের আওয়াজ, গুলির আওয়াজ, কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাবার শব্দ এখনও কি শোনা যাচ্ছে ?

কিন্তু এসব কথার জবাব পাবার আগেই সেই মহিলার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—ও মিনুসে তাড়াতাড়ি কর। কখন তো ঢুকেছিস। তাড়াতাড়ি বের হ'। নাহলে আমার নতুনবাবু রাগ

করে চলে যাবে যে? একথা শেষ করেই গলা নামিয়ে সে আর এক মহিলাকে বলে—ও মাসি, এক ঘণ্টার বেশি হ'ল ও ঘর আটকে রেখেছে। ক' পয়সা দিল তোমায়? আমার ক'জন খদ্দের যে হাতছাড়া হয়ে গেল। বলনা ওকে বের হতে।

পিনু অবশ্য সব কথাই শুনে ফেলল। কিন্তু কি করবে সে? এ কোন্ জগতে এসে পড়ল? এখান থেকে বের হবে সে কি করে? তনুটাও যে কোথায় সট্‌কে পড়েছে কে জানে? খুব রাগ হচ্ছিল তার। কিন্তু সে রাগ বাইরে প্রকাশ করবার আগেই সেই মহিলা তাকে অন্য একটা ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

এই হ'ল ভাবনা। সেই প্রথম পরিচয় হ'ল ভাবনার সঙ্গে। তারপর কোথায় যে পিনুর রাগ পালিয়ে গেছে, কে জানে? মনে হচ্ছিল—হায়, কেন ভাবনার সঙ্গে আগে যোগাযোগ হয়নি?

একথা মনে হতেই পিনু আর কিছু বলতেই পারল না তনুকে। চুপচাপ দু'জন চলে এসেছে। তাদের প্ল্যানমাফিক কাজ সেদিন আর হল না। দু'বন্ধুর মধ্যে মেলামেশাটাও কিন্তু অনেক নেমে গেল এরপর থেকেই।

অথচ ভাবনার আকর্ষণ পিনুকে যেন কাঁচপোকার মত টানছিল। এরপর কলেজের অফ্ পিরিয়ডে অন্য বন্ধুদের এড়িয়ে নবীনচাঁদ বড়াল লেন, রাইমোহন পাল লেনে ক'দিন ঘুরেও এল সে। কিন্তু ভাবনা নেই। ভাবনার দেখাই পেল না। মন খুব খারাপ হয়ে গেল। বাড়ি মনে রাখতে সে কি ভুল করল? অথচ ভাবনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা যে খুব জরুরী তার কাছে।

তাই একদিন ফাঁকা পেয়ে কথাটা বলেই ফেলল—"তনু আমাকে ওখানে আবার একদিন নিয়ে যাবি?"

তনু শুনে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। সিগারেটের সে ভক্ত নয়। কিন্তু সেদিন একটা সিগারেট চেয়ে নিল সে পিনুর থেকে। তারপর বলল—একটা চা আনা দেখি। অনেকটা সময় কেটে গেল

এভাবে। যেন ছেলেমানুষকে অন্যমনস্ক করে দেবার চেষ্টা। পিনু বুঝল সেকথা। তাই এবার তাগাদা দেয়—"কিরে এবার চল তাহ'লে।"

তনু উঠে দাঁড়াল। বন্ধুর হাত ধরল। গভীর একটা চাপ দিল। তারপর বলল—চল। তবে জানিস তো ভাবনা রোজ আসে না। দেখি আজ তোর কপালে কি আছে ?

তনুকে কিন্তু আর অনুরোধ করার দরকার হয়নি। পিনু এরপর নিজে থেকেই চলে আসতে পেয়েছে। চিনে ফেলেছে পথঘাট বাড়ি। সুলুকসন্ধান করে আরও জেনেছে কত কথা।

সব থেকে বড় কথা ভাবনার বিষয় পিনু সব জেনে ফেলেছে এক এক করে।

ভাবনার কথা ? কিন্তু এখন সে সব কথা ভাবতে গেলেই যেন অবাক লাগে। হোঁচট খেতে হয়। কোথায় কালিকাপুর স্টেশনের কাছে এই যারদা গাঁ, আর আজ কোথায়ই বা সেই ভাবনা ?

ঘোষ সাহেব এবার যেন ঘোর কাটিয়ে ওঠেন। অথচ এখানে আসা নিয়ে কি যেন সব ভাবছিলেন ? ভাবনাকে কি যেন সব কথা দিয়েছিলেন তিনি ? কি যেন বলেছিলেন তাকে ?

ঘোষ সাহেব একটু হাসেন। মনে মনেই। জোরে হাসলে লোকে আবার পাগল টাগল ভাবতে পারে তাঁকে। কিন্তু আজ এখন এখানে ওসব কথা মনে পড়ল কেন তার ? ভাবনাকে তিনি মনে রেখেছেন, মানে তাকে ভুলে যাননি আজও—এই কি খুব বড় একটা কথা নয় ? তা কাকে কি কি কথা দিয়েছিলেন তা' মনে রাখা এমন কি আর জরুরি ?

ঘোষ সাহেব দাঁড়িয়ে পড়লেন। কত আর হাঁটবেন ? কতটা পথ বাকি এখনও ? কাউকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলে হ'ত না ? ভাবেন তিনি। অথচ পথে তেমন কাউকেই চোখে পড়ল না। একটু আগে ক'জন মেয়েমানুষ কলসী কাঁখে যাচ্ছিল। তাদের

জিজ্ঞাসা করার জন্যে কাছে যেতেই তারা ঘোমটা টেনে পাশে সরে গেল।

ভাবনার কথা তাই মনে পড়ছেই। কত সহজ ছিল সে। কত সহজেই না মিশে গিয়েছিল পিন্টু-র জীবনের সঙ্গে। পিন্টু মানে মিঃ ঘোষ। কিন্তু পিন্টু যে কী করে মিঃ ঘোষ সাহেব হয়ে গেল সে এক ইতিহাস। ভাবতেই হাসি পেল তার। সে হাসি বড় করুণ। যাক্ এখন এই অবসরে ভাবাই যাক না ভাবনার কথা। ঘোষ সাহেব ভাবলেন।

ভাবনা তার জীবনের কত কথাই না বলেছিল। বলেছিল অকপটে। কোনও কিছুই লুকোছাপা করেনি সে।

সেদিন ভাবনার কথা শুনেছে পিন্টু। কোনও কথাই সে বলেনি। বলেনি মানে বলতে পারেনি। কেবল হাত পা নিশপিশ করে উঠেছে। খাট থেকে লাফ দিয়ে উঠে দুমদাম আওয়াজ করে ছোট ঘরটাতে পা ফেলেছে সে। কিন্তু ভাবনা তার হাত ধরে এনে আবারও খাটে বসিয়ে দিয়েছে। কপালের ঘাম মুছিয়ে দিয়েছে শাড়ির আঁচল দিয়ে। পিন্টু আর কিছু বলতে পারেনি। করতেও পারেনি কিছু। তবে একটাই কাজ করেছিল বসে বসে। একের পর এক সিগারেট শেষ করেছে। বেশি সিগারেট খেলে ভাবনা তাকে বকত। কিন্তু সেদিন ভাবনাও কিছু বলেনি। হয়ত বলতে চায়ওনি।

কেননা সে তখন নিজের কথা বলতেই ব্যস্ত,—বুঝলে দাদা, ভাবনা বলছিল—বাড়ি ছিল বনগাঁ লাইনের মসলন্দপুরে। ওদের বাবা জন মজুরের কাজ করত। শক্ত সমর্থ ছিল। খুব খাটিয়ে ছিল। ফাঁকি দিতই না। খুব যত্ন করে কাজ করত। লোকে ডাকত, আদর করত। তাই প্রায় প্রতি দিনই কাজ জুটে যেত। তাছাড়া দু-চারটে বাড়িতে টুকটাক কাজ করে আমিও পেতাম কিছু

কিছু। তাতেই আমাদের বেশ চলে যেত। ছেলেমেয়েও স্কুলে যেত, পয়সা তো লাগত না। ভালই ছিলাম। অথচ সেই ভাল থাকাই হ'ল কাল। কথা বলতে বলতে ভাবনা থেমে গেল। কেমন যেন আনমনা লাগছিল তাকে। উঠে গিয়ে ঘরের ফ্যানটা আরও একটু জোর করে দিয়ে এল। ফিরে এসে বসল খাটে। চুপ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ। কী যেন ভাবছিল সে।—দাদা—! ডাক শুনে এবার অবাক হয়ে গেল পিনু। এ যেন তার পরিচিত ভাবনার গলার আওয়াজ নয়। এ যেন অন্য কেউ। ভাবনা আবারও ডাকল, দাদা! এবার যেন ঘোর কাটল পিনুর। সে মুখ তুলে সরাসরি তাকাল এবার ভাবনার দিকে। ভাবনা তার কথা আবারও শুরু করল, —সেই ভাল থাকাই হল খারাপ। ক'দিনের জ্বরে অত বড়ো সাজোয়ান মানুষটা দেখ না দেখ আমার চোখের সামনেই মরে গেল। একটু কাজকর্ম মিটতে না মিটতেই দেখি পাওনাদাররা এসে হাজির। তাদের খাই মেটাবার আগেই বাড়িওয়ালা দিল রাস্তা দেখিয়ে। তার নাকি অনেক টাকা পাওনা। অনেক মাসের ভাড়া নাকি বাকি। অবাক হয়েছি দাবি শুনে। ভাবনা বলছিল। তা পথে নেমে এলাম। বাচ্চাদুটো স্কুলে গেলে একটু টিফিন পেত। কিন্তু সেও কি আর সবদিন পাওয়া যায় নাকি? তাছাড়া প্রতিদিন তো আর স্কুল থাকে না।

শেষে একজন বড় ব্যবসাদার এক বড়মানুষের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লাম সেদিন। ওদের বাবা ওনার বাড়িতে অনেকবার কাজ করেছে। বাচ্চা দুটোকে দেখে দেখে কেমন কেমন যেন মায়া হ'ল তেনার। বড় দয়ার শরীর তো! বুঝলেন? কথা শেষ করে ভাবনা কেমন যেন একটা হাসি দেয়। পিনু বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ভাবনাও পিনুকে ওভাবে তাকাতে দেখে আর কিছু বলে না। নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে তার কথা আবারও শুরু

করে দেয় —তা' শ্রীযুক্ত ভ···এটুকু বলতে না বলতেই ভাবনা জিভ কাটে। নিজেই নিজের কান মলে দেয়। বলে, তোমরা লেখাপড়া জানা লোক! ওর নাম বললে এক ডাকেই চিনতে পারবে। সমাজের এক কেষ্টবিষ্টু লোক। না, যাক ওর নাম আর বলে কাজ নেই। কোথা থেকে শুনে ফেলবে। আমি বড় বিপদে পড়ব তাহলে। তার থেকে যা বলছিলাম তাই বলি বরং। একদিন আমার সেই আশ্রয়দাতা বললেন—দেখেছ তো এখানে কাজকর্মের তেমন সুবিধা হচ্ছে না। তার চেয়ে একদিন আমার সঙ্গে কলকাতায় চলো দেখি তোমার একটা হিল্লে করা যায় কী না। আমি তো প্রতি সপ্তাহে বাজার করতে ওদিকে যাই-ই।

আমি তো একথা শুনে কেঁদে ফেলেছি। তার পা দুটো জড়িয়ে ধরেছি। তিনি বললেন—আরে কর কি কর কি! ওঠ ওঠ। বলে নিজে সরে গেলেন পাশে—গায়ে হাত দিয়ে তুলতে পারতেন আমাকে, তা' কিন্তু করলেন না। সবাই শুনে বললে—যা এবার তোর বরাত খুলে গেল। আমি তো সোয়া পাঁচ আনার সিন্নিই মানত করে বসলাম।

ভাবনা চুপ করে। সেদিনের কথা মনে হতেই ভাবনা কেমন যেন হয়ে যায়। কী যেন বলতে গিয়েও আর বলতে পারে না সে। বাধো-বাধো ঠেকে।

একটু চুপ করে থাকে ভাবনা। পিনু অবশ্য কোনও কথাই বলে না। ভাবনা বলে চলে—তা কর্তার সঙ্গে কলকাতা এসে এখানে ওখানে কত জায়গায় ঘুরলাম। কালীঘাটে পুজো দিলাম। উনি আমাকে নতুন নতুন শাড়ি জামা জুতো সব কিনে দিলেন। টুকটাক খাওয়াও চলছিল। বাচ্চাদের জন্যেও কিনে দিলেন কিছু কিছু। বেলা পড়ে এসেছিল। একটা দোকানে নিয়ে গিয়ে ভরপেট খাওয়ালেন। ভাবছিলাম, এ দেবতার ধার শোধ করব কি করে?

ততক্ষণে উনি টাকা পয়সা মিটিয়ে দিয়েছেন। বললেন—ভাবনা আজ আর বাজার করব না। কালকে বাজার করে ফিরব। উনি আর কিছু বললেন না। আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম—আমার বাচ্চা দুটো কার কাছে থাকবে? উনি আমার দিকে তাকালেন। হয়তো বুঝতে পারলেন আমার মনের কথা। বললেন—তোমার নিজের জন্যেও তো ভাবতে হবে তোমাকে। কতটা লম্বা জীবন পড়ে আছে তোমার।

ওর কথা শুনে আমি নিজের দিকে তাকালাম। কেমন যেন লজ্জা লাগল।

এরপর উনি আমাকে হোটেলের একটা ঘরে নিয়ে এলেন। হোটেলটা ঐ দোকানের ওপরই। বললেন—আমরা আজ এখানে থাকব।

আমি তো অবাক। কর্তা বলেন কি? একটা ঘর, একটাই খাট বিছানা। এ ঘরে উনি থাকলে আমি থাকব কি করে? থাকব কোথায়?

ভাবনা বলছিল তার ভাবনার কথা। কর্তা কিন্তু কোনও জবাব দিলেন না আমার সেকথার। হঠাৎই লাইট অফ করে আমাকে তুলে নিলেন বিছানার ওপর। আমি কিছু বুঝে উঠতেই পারলাম না। আমি বাধা দিলাম না। দেখলাম উনি খুব তৃপ্তি দিচ্ছেন আমাকে।

সেই শুরু। ভাবনা যেন সেদিনের কথা মনে করে আজ মজা পায়। বাড়ি ফিরে বাবু যেন অন্য লোক। জানালেন, আমাকে নিয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছিলেন। এ ছাড়া বাড়িতে উনি আমার দিকে ভাল করে তাকাতেনও না। চেনেনই না যেন। ওদিকে গিন্নিকে দিয়ে ছেলেমেয়েদেরও নতুন জামাকাপড় দিয়েছেন। থাকার জায়গাও করে দিয়েছেন। ওর বাড়িতে আমায় গিন্নিমার ফাইফরমাস খাটতে হ'ত। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

ব্যাস্, প্রতি হপ্তায় নিয়ম করে কর্তার সঙ্গে কলকাতায় আসি।

তখন কিন্তু তিনি আবার এক অন্য লোক। আমায় কী করে আদর করবেন কী করে খুশি করবেন বুঝে উঠতেই পারতেন না যেন! পুরনো কথা মনে করে ভাবনা একটু হাসল। হাসলে ওকে খুব মিষ্টি দেখায়। ভাবনা কথা বলছিল—তা আসতেই হয় কাজের ধান্দায়। কিন্তু প্রতিবার তো আর নতুন নতুন জামা কাপড় জোটে না। অথচ না এসেই বা উপায় কি? সংসার চলে কি করে? তাই কাজের চেষ্টায় লেগে থাকি। তা এখন দিনে আসি দিনেই ফিরে যাই। কিন্তু কাজ আর জোগাড় হয় না। আরে বাবা, কাজ হওয়া কি আর অতই সহজ? দেখছ না কত হাজার হাজার বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। লেখাপড়া জানা সব।

ভাবনা বলল—বুঝলে দাদাবাবু, সেই হ'ল হাতেখড়ি। কর্তার দৌলতে এ পাড়ার কাছে পিঠেও ঘুরে গিয়েছি ক'বার। পথও চেনা হয়েছে। আলাপও হয়েছে ক'জনের সঙ্গে। তাই একদিন মসলন্দপুর থেকে একা একাই চলে এলাম সাহস করে। ব্যাস্ এখানে ক'খেপ দিয়ে বেলা পড়ার আগেই বাড়ি।

এবার আস্তে আস্তে কর্তার নজর থেকে সরিয়ে নিলাম নিজেকে। কেননা প্রতিবারই তো আর হোটেলে খাওয়া হয় না আর নতুন নতুন জামা কাপড়ও পাওয়া যায় না। অথচ দিতে হয় অনেক। আমি যে তার বাঁধা। তাছাড়াও ওখানে তো আমাদের কিছু ছিল না। বাচ্চাদের নিয়ে তাই একদিন পালিয়ে এলাম বারাসত। সব দিক সামলে আমার ব্যবসাও চালিয়ে যেতে লাগলাম।

কথা শেষ করে ভাবনা থামল। পিনু অবাক হয়ে গেল এসব শুনে। বলে কি? এও কি সম্ভব? এমনও ঘটে। সেদিন আর কোনও কথা বলতে পারেনি সে। চুপচাপ চলে এসেছে।

তারপর অনেক দিন আর যাওয়া হয়নি ওদিকে। ভাবন একদিন বলেছিল ওকে কোনও একটা হাতের কাজ শেখার ব্যবস্থা

করে দিতে। এ ব্যবসা তার নাকি আর ভাল লাগছে না। ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে। পিন্টু বলেছিল চেষ্টা করবে। তখন সঙ্গে সঙ্গে কিছু করতে পারেনি। তাই ওদিকে যাবার কথা আর ভাবেনি। তা ছাড়া পড়ার চাপও ছিল। অবশ্য হাল ছাড়েনি সে। একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে, সে জানে।

তা' সেদিন ফাইন্যাল পরীক্ষার পর সবাই যখন ঠিক করল সিনেমা দেখতে যাবে তখন পিন্টু কিন্তু ওদের সঙ্গে যেতে চাইল না। ভাবল, আজ একটু ভাবনার সঙ্গে দেখা করতে গেলে কেমন হয়।

অথচ বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে যাওয়া গেল না। একটু মনটা যেন কেমন করল পিন্টুর। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

এরপর অবশ্য সময় করে চলে গেল একদিন। একদিন মানে রেজাল্ট বের হবার দু-চার দিন পর। আর নতুন কাজে জয়েন করার কদিন আগে। বাবার জোরেই চাকরি জুটে গিয়েছিল। যাহোক, পিন্টু ভাবল নতুন চাকরিতে বুঝে নিতেও একটু সময় লাগে। নিজের সঙ্গেও কথা বলার সময় হয়তো পাওয়াই যাবে না তখন। অগত্যা ভাবনার সঙ্গে একটু গল্প গুজব করে আসবার কেমন যেন একটা তাগিদ অনুভব করল পিন্টু। খুব ক্যাজুয়ালি চলেই গেল সে।

আর সে এসেছে এ খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবনা তার এক নতুন খদ্দেরকে বাইরে বসিয়ে রেখে চলে এল। পিন্টুর হাত ধরে একেবারে টানতে টানতে নিয়ে গেল ঘরে। দরজা বন্ধ করে দিল। অভিমানী গলায় জিজ্ঞাসা করল—সেদিন এলে না যে? রেজাল্ট কেমন হ'ল? কী চিন্তা হচ্ছিল আমার। কদিন খেতেও মন চায়নি। কাজেও মন বসেনি। খালি ভেবেছি তুমি কবে আসবে?

সেই ভাবনা। কিন্তু আজ আবার এখন তার কথা মনে পড়বে কেন? ঘোষ সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। এরকম সেণ্টিমেণ্ট্যাল-ফুল তো তিনি নন্।

অবশ্য ভাবনার সঙ্গে তার যে এক অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সে খবর ও-বাড়ির সবাই রাখত। কিন্তু শুধু ও-বাড়িই বা কেন, বলতে গেলে বলতে হয় ও-পাড়ার অনেকেই রাখত।

....

মজা এই—এই ভাবনার সঙ্গেই পরে তার দেখা হল না। ভাবনার শরীর একটু খারাপ হয়েছিল। আসলে তার তো বয়স হচ্ছিল। এতো খাটাখাটুনি তার পোষাবে কেন? তাই কদিন আসতে পারবে না আগেই বলে গিয়েছিল। অথচ সেদিন তার আসবার কথা। কিন্তু গিয়ে দেখল ভাবনার বদলে তার জন্যে বসে রয়েছে অজিতা।

এই নতুন মেয়েটিকে অবশ্য অল্প ক'দিন আগেই ভাবনার সঙ্গে ঘুরঘুর করতে দেখেছিল পিনু। ভাবনাই জানিয়ে ছিল, অজিতাকে কদিন আগে শেয়ালদহ স্টেশনে একা একা ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। তারপর একথা-সেকথার পর ওকে একেবারে তুলে এনেছে। শুনেছে, কিন্তু তখন ঠিক অত টান পড়েনি পিনুর।

অজিতা তাকে ঘরে নিয়ে বসাল। বলল, দিদি খবর পাঠিয়েছেন শরীর এখনও ঠিক হয়নি। আসতে ক'দিন দেরি হবে। আপনি যদি পরে আসেন।

এসব কথা শুনে পিনু কিন্তু আর বসেনি ওখানে। অজিতাও সাধাসাধি করেনি। পিনু এবাড়িতে এলেও ভাবনা ছাড়া অন্য কারও সঙ্গেই কথা বলত না। ভাবনার সঙ্গে অজিতাকে কদিন দেখে ছিল বলেই পিনু তার কথা শুনেছিল। নাহ'লে?

—না হ'লে? নাহ'লে আবার কি? অজিতা অভিমান করেই বলেছিল আর একদিন। ভাবনা সেদিনও আসতে পারেনি। অজিতাই পিনুকে ডেকে নিয়েছিল ঘরে। অজিতা তার কথা তখনও শেষ করেনি—দিদি নেই বলে তার বোনের ঘরেও কি বসা যাবে না বাবু?

খুব অবাক লেগেছে পিনুর এধরনের কথা শুনে। কেমন যেন গেঁয়ো গেঁয়ো ভাব। এতদিন এতবছর এখানে এসেও এরকম মজার চরিত্র আর দেখেনি সে। কেমন যেন লাগল। বলল—ঠিক আছে। চলো তোমার ঘরে গিয়েই বসি।

আসলে এসব পুরনো কথা ঘোষ সাহেবের মনে পড়ার কথা নয়। সকাল থেকে দম দেওয়া কলের ঘড়ির মতো সারাদিন রুটিন-মাফিক কাজ করে যান তিনি। রাতে দম যখন ফুরিয়ে যায় তখন বিছানায় ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। গিন্নি রাগ করেন—বিশ্রাম না নিলে শরীর টিকবে কি করে? কিন্তু অবসর পান কোথায়? নিজেকে নিয়ে চিন্তা ভাবনার সময় কোথায়? এই রকম কাজ করতে করতেই একদিন যে ধুপ করে চোখ বুজবেন তা যেন জানা। ফলে একটু সুযোগ পেলে ঘোষ সাহেব নিজেকে নিয়েই ভাবতে বসেন।

কিন্তু এসব চিন্তা করতে গিয়েই ঘোষ সাহেব একটু বিরক্ত হলেন। ভাবনা-চিন্তা কথার সঙ্গেই যে ভাবনার কথা, পিনুর জীবনের এক অধ্যায় জড়িয়ে আছে। জড়িয়ে রয়েছে অজিতার কথাও। ভাবনা আর আসতে পারেনি। কথাও রাখা হয়নি পিনুর। কোথায় যেন হারিয়ে গেল ভাবনা। অজিতার সঙ্গেও খাতির জমে উঠেছিল বেশ। সে বেচারীও একদিন চলে গেল কোথায় যেন। ভাগ্যিস তাকে কোনও কথা-টথা দেননি। তাহ'লে আবার আর এক আফশোষের কথা হ'ত!

ঘোষ সাহেব ভাবেন। কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারলে তাতে বেশ অস্বস্তি লাগে তার। কেন যে ভাবনাকে কথা দিয়েও রাখা গেল না? কারণ খুঁজে পাননি তিনি। ছেড়ে দিয়েছেন সে সব ভাবনা-চিন্তা।

অথব জগ এসে যখন তার কাছে হাত জোড় করে দাঁড়াল তখন তিনি আর না বলতে পারেন নি। না বলবেনই বা কি করে ?

তারই অফিসের নিচু তলার স্টাফ্ জগ। অবশ্য সেটা খুব বড় একটা কথা নয়। আসলে, ওই কথা দিয়ে কথা না রাখলে যে কী বিপদ হয়, কী মানসিক এক জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তাতো জেনে গিয়েছেন ঘোষ সাহেব। ভাবনাকে বলেছিলেন, কিছু একটা করবেন, দেখাও করবেন। কিন্তু হায়! সে বেচারীর সঙ্গে আর কি দেখা হবে জীবনে ? কোথায় হারিয়ে গিয়েছে ভাবনা কে জানে ?

আসলে এসব কথা মনে হওয়াতেই জগকে কথা দিয়েছিলেন বলেই আজ তা রাখতে এসেছেন। কিন্তু এই আসাতেই আজ তার মনের ওপর দিয়ে যেন এক ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কত কথা, কত স্মৃতি কত প্রিয়জনের মুখ যেন আজ সুযোগ পেয়ে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু মজা এই জগকে কথা দিয়েও তো তিনি প্রথমে তা' রাখতে পারেন নি। কথার কথা রাখাও যায়নি। অফিসের সবাই এলেন সেদিন। বড় সাহেবের আর আসা হ'ল না। কেন যে ঘোষ সাহেব সেদিন আসলেন না, আসতে পারলেন না সেকথা আজ যে নিজের কাছেও খুব একটা পরিষ্কার নয়। হয়তো মিসেসের সঙ্গে কোনও পার্টিতে যাবার কথা ছিল।

তবে এই না-আসা ব্যাপারটা কেমন কেমন যেন লেগেছিল তার নিজেরই কাছে। জগর একমাত্র ভায়ের খুব খারাপ অসুখ হয়েছিল। কোম্পানির যত রকম লোন পাবার আছে সবই নিয়েছিল জগ। ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ঘোষ সাহেবই। হাসপাতালেও ডাক্তার বন্ধুদের চিঠি লিখে ফ্রী বেড্ করে দিয়েছেন। কিন্তু এতেই তো আর সব হয় না। ধার শোধ দেবার পর জগ হাতে পেত কি ? তার আর বৌ-র পেট কি চলে ততে ? তারপর

দামী দামী ওষুধ কেনার খরচ তাকে কে দেবে? ঘোষ সাহেব নিজের পকেট থেকে যতটা পেরেছেন, যতদূর পেরেছেন, জগকে সাহায্য করে গিয়েছেন। ভাই সুস্থ হয়ে আসাতে জগ তাই বাড়িতে মানসিক কালীপুজো দিয়েছিল। অফিসের সবাই এসেছিলেন তখন। ঘোষ সাহেব আসতে পারেননি।

এসব নিয়ে জগ খুব দুঃখ করছিল অফিসে। কী করে যেন ঘোষ সাহেবের কানে যায় কথাটা। ফলে ঘোষ সাহেব জগকে ডেকে যাবার কথা জানিয়ে দেন।

জগ হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বাসই হচ্ছিল না তার। বড় সাহেব, হুজুর তাহলে সত্যিই যাবেন তার কুঁড়ে ঘরে? হাত কচলাতে কচলাতে সাহেবের ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল সে।

তারপর অফিসে ক'দিন চলল কেবল গুজগুজ আর ফুসফাস। জগর মাইনে বাড়া আর ঠেকায় কে? জগ সাহেবের নেকনজরে পড়েছে। ক'জন কেরানীবাবু আবার আগ্ বাড়িয়ে জগ-র সঙ্গে পুরনো সম্পর্কটা ঝালিয়ে নিতে তাকে বিড়ি চা পানও খাইয়ে দিল।

এত দুঃখকষ্ট পেয়েছে জগ জীবনে যে আর বলার নয়। দুঃখী জীবনই তার। একটা ছোট ভাইকে রেখে মা বাবা দু'জনেই অল্প ক'মাসের মাথায় তাদের ছেড়ে চলে গেলেন। ওদিকে ভাইটাও পড়ল অসুখে। তখন যদি ঘোষ সাহেব দেবতার মতো এগিয়ে না আসতেন তবে আজ সে কোথায় থাকত? অবশ্য আর একজনকেও তো প্রশংসা করতেই হয়। কিন্তু যতবার তাকে এই কৃতজ্ঞতার কথা বলতে গিয়েছে জগ, ততবারই সরমা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে দিয়েছে—ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। আমি না তোমার বৌ। তোমার ধর্মপত্নী। জগ সত্যিই অবাক হয়ে যায় এসব কথা ভাবতে গিয়ে। বাবা নেই মা নেই ভাই অসুস্থ—কেবল চাকরীর কটা টাকা—তা' গেলে পেট চলে কি করে? জমি জিরেত যা ছিল সবই তো

গিয়েছে, কেবল আছে পুরনো বাড়িটা। তার সে-সময় যা অবস্থা, চিন্তা করা যায় এখন? সবাই বললে একটা বিয়ে করো জগ—না হলে তো তুমি গেলে! কিন্তু কে বিয়ে করবে তাকে এতসব জেনেও?

কিন্তু বাংলাদেশে মেয়ের অভাব? তাই একদিন সরমাও তালেগোলে এসে গেল তার জীবনে।

আর প্রথম থেকেই সরমা বুঝে নিয়েছে জগর অবস্থা। অথচ তার লেখাপড়াই বা কতটুকু? ঐ যা একটু রূপ আর শরীর দিয়েছেন ভগবান—নাহলে তার জোর কোথায়? স্বামীকে কতবার বলেছে সরমা—আমায় তুমি যে কোনও একটা কাজের জোগাড় করে দাও না? এইতো এ গাঁয়ের কতজনই তো যায়। যায় যাদবপুর বালিগঞ্জ ঢাকুরিয়ায় বাড়ি বাড়ি কাজ করতে। সেই সাত সকালে বেরিয়ে আবার সাঁঝের বাতি দেবার আগেই ঘরে ফেরে তারা।

এসব শুনে জগ রাগ করে। কথা বন্ধ করে দেয়। তার সাধের বৌ যাবে লোকের বাড়ি বাড়ি ঝি-গিরি করতে? আরে ছিঃ ছিঃ! টাকার যাই দরকার থাক না কেন তাই বলে নিজেকে এভাবে বিকিয়ে দিয়ে? না, না— জগ কিছুতেই রাজি হতে পারেনি।

অথচ ক'মাস বাদে একদিন রাতে খাবার পর যখন তারা গল্প করছে তখন সরমা এক ফাঁকে উঠে গেল। তারপর জগ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই তার কোলের ওপর দশ টাকা কুড়ি টাকা পঞ্চাশ টাকার অনেকগুলো নোট ফেলে দিল। সেদিনের কথা ভাবতে গেলে আজও অবাক হয়ে যায় জগ। গায়ে যেন কাঁটা দেয়। এ টাকা, এত টাকা এল কোথা থেকে? কে দিল, কেন দিল? সরমা পেল কোথা থেকে? জেরা করে জগ।

—ভয় নেই। সরমাই তাকে আশ্বস্ত করেছে। এ তার নিজের রোজগারের টাকা। ক'দিন থেকেই সে কিছু একটা কাজের চেষ্টা করছিল। জগর অবস্থা তো সে জানে। দেওরকে হাসপাতালে গিয়ে দেখেও এসেছে একআধবার। বুঝেছে ওখানে দেখতে যাবার

থেকেও টাকা পাঠানো আরও বেশি জরুরি। ওষুধ কেনা ফল কেনা—খরচা কম নাকি ? তাই একদিন জগ অফিসে গেলে পরের ট্রেনে চেপে আধ ঘণ্টার মধ্যেই চলে এসেছে সে কলকাতায়। ভাগ্য ভাল, একজন কাজের লোক খুঁজছিলেন। তাঁরা কর্তা-গিন্নি দুজনেই চাকরি করেন। বাড়িতে বুড়ি মা অসুস্থ। কিন্তু তাকে দেখে কে ? সরমাকে পেয়ে তারা হাতে স্বর্গ পেলেন। ওরা কাজে যাবার পর হাজির হয় সরমা। আর ওদের কেউ একজন এসে গেলেই চলে আসে সে। জগ বাড়ি ফেরার আগেই। ছুটির দিনে তো কর্তা গিন্নি বাড়ি থাকেন। সরমা আর যায় না সেদিন। জগ জানতেই পারে না এসব কথা।

জগ অবাক বিস্ময়ে শোনে তার বৌয়ের কীর্তিকলাপ। মিষ্টি মেয়েটার পেটে পেটে এতো দুষ্টুমি। খুব আদর করতে ইচ্ছে হয়। বেচারী। এ সংসারে এসে কোনও সাধ আহ্লাদই মিটলো না তার। অথচ কম টাকা তো সে এনে দেয়নি জগর হাতে। জগর ধারটারগুলো এবার খুব তাড়াতাড়িই শোধ হয়ে যাবে। ভায়ের চিকিৎসার টাকার জন্যেও তাকে আর ভাবতে হবে না। জগকে আর পায় কে ? বাড়িটাতেও এবার একটু হাত দেওয়া দরকার। ভাবে সে। তাই জগ আর কোনও আপত্তিই করেনি। টাকার গন্ধ বড় মিষ্টি। ফলে জগ আর বাধা দেয়নি সরমাকে। ঘরের শ্রীও একটু একটু করে ফিরছিল। কেউ আসলে বসতে দেওয়া যায়। জগ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ওরা যেন ওরকমই থাকে। বাবু আর গিন্নী কী ভাল, ভগবান তাদের মঙ্গল করুন! আজ কী আনন্দ জগর বড় সাহেবকেও সে তাই নির্ভাবনায় আসতে বলেছে তার বাড়িতে।

কিন্তু ঘোষ সাহেব আসতে গিয়েও ভুল করে বসলেন। একবার ভাবলেন সবার সঙ্গে না এসে ভুল করেছেন। তাছাড়া ট্রেনে এলেই বা ক্ষতি কি ছিল ? জগই স্টেশন থেকে নিয়ে যেতে পারত।

যাক্ যা হবার তাতো হয়েছে। ঘোষ সাহেব একটু স্থির হয়ে ভাবতে চাইলেন। জগ কি যেন বলেছিল ? এলাহি ভবন ছেড়ে বাঁ হাতে একটু এগিয়ে গেলেই দূরে দেখা যাবে ইস্টার্ন বাইপাস। তার আগেই জগর বাড়ি। ডান হাতে। ওদিকে ঐ একটাই কোঠাবাড়ি। যদিও এখন তা অনেকটা ধ্বসে গেছে কিন্তু দালান বাড়িই তো !

ওদিকে বেলা পড়ে এসেছে। ঘোষ সাহেব জীবনে এই প্রথম বোধ হয় ঠাকুরকে স্মরণ করলেন। একটু থেমে তারপর দরজায় গিয়ে শিকল ধরে ঝাঁকালেন। পুরনো দরজা একটু কেঁপে উঠল। ভেতরে তখন শাঁখের আওয়াজ শোনা গেল। ঘোষ সাহেব আবারও শিকল নাড়ালেন। এবার ভেতর থেকেই কিশোর কণ্ঠে আওয়াজ এল —কে ? কাকে চাই ?

—জগ ! জগ আছে ? বলেই থেমে গেলেন ঘোষ সাহেব। বাড়িতে সব মানুষের জন্যে এক যথাযোগ্য সম্মানের আসন বসান রয়েছে। যে যা চাকরীই করুক না কেন। কথাটা মনে হতেই ঘোষ সাহেব এবার বললেন—জগৎবাবু বাড়িতে আছেন ?

দরজা খুলে গেল এবার। একটা সাত-আট বছর বয়সের ছেলে এগিয়ে এল। বলল—দাদা তো বাড়ি নেই। দাদা তো এতক্ষণ ছিল। এই তো এখুনি উঠে গেল। আপনি কোথা থেকে আসছেন ? আপনি একটু বসুন। এবার সে ঘোষ সাহেবকে ভেতরে আসার পথ দেখায়। আর দাঁড়ায় না। বলে—আমি বসুদার তাসের আসর থেকে দাদাকে ডেকে আনছি। আমি যাব আর আসব।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল সে। ঘোষসাহেব কোনও কথা বলারই সুযোগ পেলেন না।

বেরিয়ে যেতে যেতে এবার ছেলেটা চেঁচিয়ে বলল—বৌদি, ও'

বৌদি, আমি দাদাকে ডাকতে যাচ্ছি। তুমি বাবুকে একটু ঘরে নিয়ে বসাও। আলোটা একটু ধর।

ভেতর থেকে এক নারীকণ্ঠ কী যেন জবাব দিল। বুঝতে পারলেন না ঘোষ সাহেব।

জগর স্ত্রীর শাঁখে ফুঁ দেওয়া শেষ হয়েছিল! তুলসীতলায় প্রদীপ দেখিয়ে প্রণাম করে এবার এগিয়ে এল ঘোষ সাহেবের কাছে।

—আসুন। জগর বৌ ডাকল তাঁকে। পথ দেখাতে হাতের প্রদীপটা একটু উঁচু করে ধরল সে। ঘোমটা একটু সরে গেল তার।

কিন্তু জগর বৌ-কে দেখে ঘোষ সাহেব চমকে উঠলেন, স্থান কাল ভুলে চেঁচাতে গেলেন। কিন্তু পরেই হুঁশ এল তার। চাপা গলায় ডাকলেন—অজিতা! অজিতা তুমি? তুমি এখানে?

বৌ থমকে দাঁড়াল—বাবু আপনি? ওঃ, আপনিই তবে ওর দয়ালু বড় সাহেব?

ঘোষ সাহেব কী জবাব দেবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। চুপ করে গেলেন। তিনি কিছু বুঝবার আগেই জগর বৌ এসে তার পা জড়িয়ে ধরল। কান্না ভেজা গলায় বলল—আমি যে অজিতা একথা এরা কেউ জানে না। বাবু আপনিও বলবেন না। আমার সংসার আমার জীবন সব যে ভেসে যাবে তাহলে? চাপা হাহাকার করে ওঠে সে।

তার কথা শেষ হতে ঘোষ সাহেব খুব যত্নে ওঠালেন তাকে! প্রদীপের আলোয় খুঁজতে চাইলেন তার সেই অজিতাকে। কিন্তু দেখতে পেলেন তার সেই অজিতা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। কপালে বিরাট এক লাল সিঁদুরের টিপ পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে জগর বৌ সরমা।

জীবনের সংসার

জীবন ? কিন্তু সেই জীবন তো আর নেই। সে তো কবেই মারা গিয়েছে। আর তার সংসার ? তার সংসারও নেই। তার বাড়ি ঘরদুয়ার কিছুই আর নেই। শুধু সরকারি খাতায় এটুকু লেখা আছে যে কসবা-রথতলায় সে এক ভাড়াবাড়িতে থাকত। ভবানীপুরের এক সরকারি দপ্তরে কাজ করতে করতেই সে নাকি অসুস্থ হয়ে পড়ে। পি জি-তে ভর্তিও করানো হয় তাকে। কিন্তু অল্পকিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। তার বাড়ি ফিরতে দেরি দেখে ছোটছেলের হাত ধরে অফিসে এসে হাজির হয়েছিল জীবন দাসের বৌ পুষ্প দাস। সেখান থেকে হাসপাতাল। কিন্তু অফিসের লোকজন ? তাদেরইবা ক্ষমতা কতটুকু ? তবুও তারা জীবন দাসের সার্ভিস বুক এ-অফিস সে-অফিস থেকে ঠিক করে এনেছিল। তার প্রাপ্য টাকাপয়সা মেটাতে এসব খুব জরুরী। তাছাড়া কম অফিসে সে ঘুরেছে নাকি ? কখনও নদীয়া, কখনও বা মুর্শিদাবাদ। আবার কখনওবা বীরভূম বর্ধমান। মানে সাহেবরা তাদের পেয়ারের লোক জীবনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে ভালবাসতেন। তাই কলকাতায় সে থাকলই বা আর কতদিন ? বন্ধু-বান্ধব লোকজনের সঙ্গে তেমন করে পরিচয় তেমন করে মেলামেশাই বা আর হতে পারল কোথায় ?

এইতো জীবনের সরকারি খাতার জীবন। আর তার পেনশন বা অন্য পাওয়ার হক্‌দার সম্বন্ধে জীবন সঠিক কোন কাগজপত্র রেখে যায়নি। তবে সরকারি কর্মচারীর জীবনবীমার টাকার উত্তরাধিকারী যে পুষ্প দাস সে কথা সে অনেক আগেই জানিয়েছে।

হেড কোয়ার্টারে বসে কাগজপত্তর ওলটাতে ওলটাতে আমি এইটুকুই জেনেছি কেবল। কাগজপত্র দেখে সরকারি কর্মচারীর ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেবার দায়িত্ব আমার। জীবনের সঙ্গে আমার

এটুকুই সম্পর্ক কেবল। নইলে মৃত জীবন দাসকে আমি দেখিনি। তার সংসার সম্বন্ধে এর থেকে বেশি কিছু আমার জানা নেই।

কিন্তু গ্রহের ফের! জীবনের সংসার আমাকে জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। মানুষের জীবন যে এত বিচিত্র হয় এত অদ্ভুত হতে পারে তা আমার জানাই ছিল না।

অথচ বড়বাবু আমার সামনে এক কাগজ ধরালেন আর আমি চমকে উঠলাম। বললাম—সুখেনবাবু, এ চিঠির কথা আপনি আগে কখনও শুনেছেন?

সুখেনবাবু হচ্ছেন আসল বড়বাবু। অফিসের কাগজপত্র, ফাইল, নথিপত্র সব তাঁর নখদর্পণে। এমন একটা কথা আমি এই অফিসে জয়েন করার সময় থেকেই শুনে আসছি। অফিসের গার্ডফাইল তাঁরই কাছে থাকে। অফিসের কাজের ব্যাপারে তিনি যথাসম্ভব নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। আমি অনেক অফিসে ঘুরেছি। কাজও করেছি অনেকের সঙ্গে। কিন্তু সুখেনবাবুর মতো বড়বাবু আমি একজনও দেখিনি। প্রতিদিন জামাকাপড় পালটাতেন। প্রতিদিনই ধোপদুরস্ত পোশাক। সমস্ত ব্যাপারটা মিলেই ছিল যেন তাঁর আভিজাত্যের চিহ্ন। তিনি হেড অফিসের বড়বাবু।

কিন্তু আমি যখন আবারও বললাম—কি হ'ল বড়বাবু? এ চিঠিতে যে সব কথা লেখা আছে সে সম্পর্কে আপনি আগে কিছু জানতেন? কিছু শুনেছিলেন? তখনও দেখি যে বড়বাবু চুপ করে রয়েছেন। তাঁর মাথা নিচু হয়ে রয়েছে।

বড়বাবুকে ওরকম অবস্থায় দেখে আমার বেশ খারাপ লাগল। আমি বললাম—কি হল দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

বড়বাবু চেয়ার টেনে বসলেন। সমস্ত ব্যাপারটাকে একটু হালকা করা প্রয়োজন—আমি মনে মনে ভাবলাম! বেল টিপলাম।

ক্যাবলা আসতেই বললাম—দুটো চা। আমারটা লিকার। বড়বাবুরটাতো জানিস্‌ই। আর শোন কটা ভালো বিস্কিট দিস।

এবার বড়বাবুকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম—বড়বাবু, আপনি এই অফিসের সর্বকিছু। আপনি যদি কিছু না বলেন তবে আমি নতুন এসে কি করে এই ঝামেলার সমাধান করব?

আমার কথা শুনে এতক্ষণ যেন বড়বাবুর হুঁশ এল। মনে হ'ল তিনি যেন এতক্ষণ কিসের একটা ঘোরে ছিলেন। ক্যাবলা এ'ল। চা' নিল। উনি চা শেষ করলেন। আমি এতগুলো কথা বললাম। কিন্তু বড়বাবু যেন কিছুই শোনেননি এতক্ষণ। আর আমার শেষ কথাগুলো কানে যেতেই উনি যেন জেগে উঠলেন। আমি এবার বড়বাবুর দিকে ভাল করে তাকালাম।

কিন্তু বড়বাবুর মুখের দিকে তাকাতেই আমি খুব বিব্রত হয়ে পড়লাম। দেখলাম ওনার চোখেমুখে কান্নাহাসির জয়পরাজয়ের যেন এক কঠিন লড়াই চলেছে। সুখেনবাবু তাঁর এতদিনের অর্জিত সম্মান, সম্ভ্রম 'বড়বাবু'র মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর, অথচ খাতাপত্তর সঠিক রাখা নেই সে অবমাননার অভিযোগও তাঁকে বহন করতে হচ্ছে।

আমি দেখলাম এসব ক্ষেত্রে চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। দেখাই যাক্‌ না জল শেষে কোথায় যায়?

এতক্ষণে সুখেনবাবু মুখ খুললেন। বললেন—জীবন যখন সরকারী বীমা প্রকল্পে পুষ্প-কে 'নমিনি' করে তার স্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করে তার সাক্ষী রয়েছেন ভবানীপুর অফিসের দু'জন সরকারি কর্মী আর সেই সময়কার অফিসার। তাঁদের আপনার কাছে ডেকে পাঠাচ্ছি। এ চিঠির বিবরণ সত্যি কি মিথ্যা তাতো প্রমাণ হয়ে যাবে তখনই।

আমি বুঝলাম যে বড়বাবু খুব সাবধানে হিসাব করে জবাব দিচ্ছেন। আমি তাই বললাম—বেশ তা না হয় হল। কিন্তু

বড়বাবু আমি যে আপনার কাছে অন্য কথা জানতে চেয়েছি। তার জবাব কি হ'ল ?

আমার কথা শুনে বড়বাবুর মুখে এবার একটু হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন—বিশ্বাস করুন স্যার। আমি এ ঘটনার কিছুই জানি না। তার সম্বন্ধে এমন চিঠিও যে আসতে পারে তাতো আমি ভাবতেই পারছিলাম না। তাইতো আমি অত চিন্তা করছিলাম। আপনি কিছু মনে করেননিতো স্যার ?

বড়বাবু এমনিতে ঠিক আছেন। কিন্তু মাঝেমধ্যে এমন হেঁয়ালি করেন না যে বলার নয়। বেশ জবাব দিচ্ছিলেন। কেবল শেষে একটু হুল ফোটালেন। বোঝো ঠেলা এবার।

আমি তাই চুপ করে থাকি। আর চুপচাপ অফিসের ফাইল পুরনো রেকর্ড ঘেঁটে চলি। সব সত্যি কথা যে আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। আয় আইন মোতাবেক সরকারি কাজ করতে হবে। আমাকে গভর্নমেণ্ট আইনের রক্ষাকর্তা করেছেন। বে-আইনী কাজ আমি করব কেন ? আর বে-আইনী বেকানুনী কাজ করলে সমাজ সংসার কি আমাকে ছেড়ে কথা বলবে ?

এই সোজা কথাটাই আমি বোঝাবার চেষ্টা করি। বারবার বলে চলি·· আইন মেনে আইনমাফিক কাজ করতে হবে। না হ'লে দেশ সমাজ সংসার চলবে কি করে ? সব যে তা নইলে ভেঙ্গে পড়বে, রসাতলে যাবে। প্রকৃতির জগতেও দেখুন না কেমন সব আইন রয়েছে।

কিন্তু দুঃখ এই যে এই সহজ কথাটাও আমি অজিতবাবুর মাথায় ঢোকাতে পারি না।

অজিতবাবু বললেন—স্যার, বিশ্বাস করুন স্যার। আমি এ বিষয়ের কিছুই জানি না। জীবন বহরমপুর থেকে বদলি হয়ে এল। সাহেবের আর্দালী। তাঁর পেয়ারের লোক। জীবন আমাকে আর অমরকে বললে যে তার বৌ-কে গ্রুপ ইনসিওরেন্সের নমিনি

করেছে। আমাদের দু'জনকে সই দিতে হবে। সাহেব সই করলেন সব শেষে। কাগজটাগজ পাঠানো হল হেড অফিসে। এসবতো অনেকদিন আগেকার কথা স্যার! অমর বেঁচে নেই। মারা গেছে বেশ ক'বছর। সে-ই সাহেবও রিটায়ার করেছেন বলে শুনেছি। এখন স্যার আমাকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া কেন স্যার? সত্যি বলছি স্যার আমি এর মধ্যে নেই। আমি এসবের কিছুই জানি না। আমাকে দেখবেন স্যার। আমায় বাঁচান স্যার। আমার বৌ-বাচ্চা রয়েছে।

অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে হাঁফিয়ে উঠলেন অজিতবাবু। আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। কেমন যেন মায়া হ'ল। একটু বোধহয় কোমল হ'ল আমার কণ্ঠস্বর। বললাম—দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

কিন্তু অজিতবাবু বসলেন না, হুড়মুড় করে এসে পড়লেন আমার পায়ের ওপর। আমার পা জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—বিশ্বাস করুন। আমার কথা বিশ্বাস করুন। আমি আমার ছেলের দিব্যি দিয়ে বলছি ও চিঠির কথা যদি আমি জানতাম তবে জীবনের সংসার বাঁচাতে আমার সংসার ছারখার হতে দেব কেন?

অজিতবাবুর কাণ্ডকারখানা দেখে আমি খুব বিব্রত হয়ে পড়ি। নিজের মনের মধ্যে তোলপাড় চলে আমার।

বড়বাবু-কে ডাকি। বলি—বড়বাবু! অজিতবাবুর স্টেটমেণ্টটা লিখিয়ে নিন। উনি সই করবেন। আপনিও সই করবেন। তারপর ফাইল করবেন। সময় করে পরে একটু আসবেন। কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে।

আমার কথা শুনে বড়বাবু বের হয়ে যান আমার চেম্বার থেকে। আমি ভাবতে থাকি, আরে এতো বেশ ঝমেলা হ'ল। কোথাকার জীবন আর তার সংসার আমাকে কেন এমনভাবে জ্বালাচ্ছে? সরকারি নথি বলছে পুষ্প হচ্ছে জীবনের স্ত্রী। অজিতবাবু ছিলেন

তার সেই ঘোষণাপত্রের সাক্ষী। তিনি এতদিন বাদেও সেই একই গাওনা গাইছেন। তবে আমার আর অসুবিধা কোথায়? যে চিঠিটা এখন এসেছে তা' ছিঁড়ে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। ওরকম উড়ো অভিযোগ কত-না কতই সরকারি দপ্তরে প্রতিদিন আসছে। তাদের সবসময় অত গুরুত্ব দিলে দপ্তরের কাজ আর চলে না।

এরকম উল্‌টো সিধে ভালমন্দ নানান কথা তখন আমার মাথায় ঘুরপাক খেয়ে চলে। আইনের সহজ সমাধানের জন্যে আমি তখন বে-আইনী পথও হাতড়ে বেড়াই। আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে।

এমন সময় একটু কফি হলে ভাল হত। আমি বেল টিপতে যাই। দেখি বড়বাবু কখন এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতে ফাইল। আমি ইঙ্গিতে তাঁকে বসতে বলি। বেল টিপি। ক্যাবলাকে দু'টো কফি দিতে বলি।

বড়বাবু ফাইল খুলে ধরেন। অজিতবাবুর বিবৃতি দেখান। আমি দেখে নিয়ে ওর হাতে ফাইল ফেরত দিই। ক্যাবলা ঘরে ঢোকে।

আমি বড়বাবুকে বলি নিন্‌।

উনি কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়েও নামিয়ে রাখেন। কেমন যেন ইতস্তত করেন। আমি বলি—কি হ'ল বড়বাবু? শরীর-টরীর খারাপ নয়তো?

আমার কথা শুনে বড়বাবু একটু মৃদু হাসেন। পরে বলেন—স্যার, যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলব?

আমি বলি—আরে! আপনি অফিসের বড়বাবু। আপনি আমায় একটা কথা বলবেন তাতে আর এমন কি?

—না স্যার। বিষয়টা অন্য। জীবনের সংসারের কথা।

—আমি চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসি।

—বুঝলেন না স্যার যদি·· । সুখেনবাবু কথা শেষ না করে

আমার দিকে তাকান। মনে হ'ল উনি যেন আমার চোখের ভাষা পড়তে চান।

—যদি ? যদি উড়ো চিঠিটা……। আমিও কথা শেষ করি না ইচ্ছে করেই। উল্টো চাল দি। দেখাই যাক্ না এই মোচড়ে কতটা সত্যি কথা বের হয়ে আসে।

—না স্যার, আমি ভাবছিলাম পুষ্প দাসকে একবার আপনার চেম্বারে ডেকে পাঠালে কেমন হয় ? সে-ও তো কিছু জানতে পারে। বলতে পারে।

বড়বাবুর কথা শুনি। কিছুক্ষণ ভাবি। শেষে বলি—বাঃ! গুড আইডিয়া। আপনি একটা চিঠি করে আজই স্পেশাল মেসেঞ্জার দিয়ে পাঠিয়ে দিন। ব্যাপারটা ঝুলে রয়েছে। তাড়াতাড়ি ফয়সালা হওয়া দরকার।

বড়বাবু ঘাড় নেড়ে বের হয়ে যান সেদিনের মতো। কিন্তু ক'দিন বাদেই বড়বাবু আবারও চেম্বারে আসেন। বলেন—স্যার পুষ্প দাস এসেছেন। ওদের পাঠাব স্যার ?

—ওদের ? আমি অবাক চোখে তাকাই।

—হ্যাঁ স্যার। পুষ্প দাস জীবন দাসের ছেলে-মেয়েদেরও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

—আরে এতো ভালই হল বড়বাবু, আপনিও একটু থাকবেন। মনে হচ্ছে আজই একটা কিছু অর্ডার বের করে দিতে পারব। আমি খুব তৃপ্তির সঙ্গেই বলি কথাগুলো।

—স্যার, আর কিছু বলবেন স্যার ? সুখেনবাবুও হাসি-মুখেই জানতে চান।

—ও হ্যাঁ। দেখুন আমাদেরই এক সহকর্মীর বৌ, ছেলেমেয়ে। বাবার অফিসেই এসেছেন তাঁরা। ওদের একটু মিষ্টি টিষ্টি খাওয়াবেন। আমিই টাকা দিয়ে দেব।

—ছিঃ ছিঃ। একি কথা স্যার ? আমরাও তো দিতে পারি।

আপনি ওসব নিয়ে একদম ভাববেন না স্যার। আমি বরং ওদের নিয়ে আসি। বড়বাবু ওদের আনতে যান।

কিন্তু পুষ্প দাসকে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। এক বিকলাঙ্গ ছেলেকে কোলে করে এক মহিলা এসে হাজির। ছেলেটির বয়স কম করেও কুড়ি বছর। সঙ্গে এক বিবাহিতা মহিলা। দু'টি অবিবাহিতা মেয়ে। সঙ্গে আরও চারটি আট থেকে পনের বছরের ছেলে-মেয়ে। এক ব্যাটেলিয়ান যেন!

আমি ওদের বসতে বললাম। কিন্তু ওরা বসলো না। আর আমি কিছু বলার আগে, কোনও প্রশ্ন করার আগে, ওই বিবাহিতা মহিলাটি বললেন—স্যার ইনি আমাদের সবার মা পুষ্প দাস। আমাদের সবার বাবা জীবন দাস। বাবা মারা যাবার পর এই মা-ই আমার বিয়ে দিয়েছেন। আর লোকের বাড়িবাড়ি কাজ করে সবার থেকে চেয়ে চিন্তে আমার এইসব ভাইবোনকে আমাদের এই মা পুষ্প দাসই খাওয়াচ্ছেন পরাচ্ছেন।

আমি মহিলাটির মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকালাম। কিন্তু এরকম সেণ্টিমেণ্টাল কথা শুনে কি আর আইন চলে? না চলতে পারে? নাকি সামাজিক বিচার হয়? আমি তাই একটু শক্ত হতে চাই। মেয়েটি সাজানো সাক্ষী, না সত্যি কথা বলছে, তাতো যাচাই করা দরকার। এমন প্রশ্ন করতে হবে যাতে মেয়েটির মরমে পশে আর সে ভেঙে পড়ে।

আমি তাই চকিতেই বলি—একদম বাজে কথা বলবে না। কে তোমার মা? সত্যি কথা বলো। না হলে কিন্তু তোমায় পুলিসে দেব। রানী দাস কে? তাকে চেনো?

এসব কথার জবাব কিন্তু এ মেয়েটি দিল না। কান্না জুড়ে দিল ঐ বিকলাঙ্গ ছেলেটি আর ঐ দু'টি অবিবাহিতা মেয়ে। আর তাদের কান্না দেখে পুষ্প দাসকে জড়িয়ে ধরলো অন্য চারটে ছেলেমেয়ে।

ওরা কাঁদছিল। ওরা কাঁপছিল। আর কাঁদতে কাঁদতে বলছিল—ও রানী নয়। ও ডাইনী! ও রাক্ষুসী! ও মা নয়। আমাদের মা এই যে এখানে। আমরা একে ছেড়ে কোথাও যাব না।

ওদের কান্না শুনে কথা শুনে অফিসের অনেকেই এসে আমার চেম্বারের কাছে ভিড় জমিয়েছিলেন। অফিসে এমন সিন্‌ক্রিয়েট করা আমার একদমই পছন্দ নয়। আমি তাই বললাম—বড়বাবু আপনি শুনুন। পুষ্প দাস আর এই ছেলেটি থাকুক। অন্যদের ঘর থেকে বার করুন। ওদের বাইরের বেঞ্চে বসতে বলুন। দরকারে ওদের ডাকা হবে।

আমার এ আদেশ আমারই অফিসে অন্যথা হবার নয়। আমি এবার গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলাম—আপনার নাম পুষ্প দাস ?

—হ্যাঁ।

—পরলোকগত জীবন দাস আপনার কে হন ?

—উনি আমার স্বামী। পুষ্প দাস ধীরে উত্তর করেন।

—মুখের কথার স্বামী ? কোন সাক্ষী আছেন ? কোন কাগজপত্র ? আমি কঠোর হতে চেষ্টা করি।

—না স্যার। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানষে। ওনার সঙ্গে কালীঘাটে মালাবদল করে বিয়ে হয়েছে। আর এই ছেলেমেয়ে সবইতো ওনার দেওয়া স্যার। হাসপাতালের কাগজ আছে স্যার।

—হুঁ। সেসব তো বুঝলাম। কিন্তু আর কেউ ?

—আমার শাশুড়ী আছেন স্যার। ওদের ঠাকুমা। তিনি সব জানেন। ওকে আনব ? পুষ্প দাস অথীর আগ্রহে আমার মত জানতে চায়।

—আচ্ছা ঠিক আছে। কালকে। কালকেই আনতে পারবেন ? আমি সাজানো সাক্ষী তৈরি করার সুযোগ আর দিতে চাই না।

—ঠিক আছে স্যার। কালই আবার আসব স্যার।—পুষ্প দাস জবাব দেয়।

ওরা চলে যেতে আমি বড়বাবুকে ডেকে পাঠাই। তাঁকে বলি—দেখুন বড়বাবু, উড়ো চিঠিটা যত্ন করে রাখবেন। রানী দাসকে এরা সব্বাই চিনল। কিন্তু পুষ্প দাস-রানী দাস-জীবন দাস আর জীবন দাসের সংসার এই এক বৃত্তে কার যে কোথায় অবস্থান ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এদের সম্পর্ক জানতে হবে। তবে জট খোলা যাবে। আপনি দেখুন জীবন দাসের ব্যক্তিগত ফাইল থেকে রানী দাসের কোন হদিস করতে পারেন নাকি?

বড়বাবু আমার কথা খুব মন দিয়ে শুনলেন। পরে বললেন—স্যার এ বিষয়টা নিয়ে আমি নিজেও ভেবেছি। আমিও খুঁজছি; কিন্তু কোন তথ্য পাইনি। তবে আপনি যখন বলছেন তখন আবারও খুঁজব।

বড়বাবুর এ কথায় আমি একটু যেন দম ফেলার সুযোগ পেলাম। মনের ওপর থেকে এক গুরুভার আমার যেন নেমে গেল। কেননা আমার মনে হ'ল যে আমার ভাবনার অংশীদার আমি আমার বড়বাবুকেও করতে পেরেছি। আসলে সবাই মিলে উঠেপড়ে না লাগলে ছোটবড়ো কোন কাজই সফল হয় না।

একথা ভেবে আমি অন্য ছোট-খাটো দু'চারটে পড়ে থাকা কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করার দিকে মন দিলাম।

কিন্তু সেখানেও গেরো। য়ুনিয়নের কর্তাব্যক্তিরা একদিন দল বেঁধে আমার ঘরে এসে হাজির। তাদের বক্তব্য—স্যার দেখতেই তো পেলেন জীবন দাসের সংসার এখন কিভাবে চলছে? ওভাবে কি বেঁচে থাকা যায়? আপনিই বলুন না স্যার? আমরাতো শুনেছি ওর কাগজপত্র সব ঠিক আছে। তবে স্যার কেন এতো দেরি হচ্ছে? আপনি আসার অনেক আগে থেকেই তো পুষ্প

দাসের দরখাস্ত আমরাই জমা করিয়েছি। আপনি স্যার নাকি এখন কিসব আপত্তি তুলেছেন? ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি দেখুন স্যার। আমরা দিন দশেক বাদে স্যার আবার খোঁজ নেব আপনার থেকে।

আমাকে জবাব দেবার সুযোগই ওঁরা দিলেন না। বলতে গেলে একধরনের হুমকিই দিয়ে গেলেন।

কিন্তু ওঁরা জানেন না যে আমি এধরনের চোখরাঙানি ঠিক পছন্দ করি না। কাগজপত্র ঠিক না থাকলে কোন রকম অর্ডার আমি বের করব না। ওঁরাই নথিপত্র জোগাড় করে দিন না! রানী দাসের অভিযোগ যে মিথ্যা সে প্রমাণের দায় তো আমার নয়। পুষ্প দাসের বা পুষ্প দাসের শুভানুধ্যায়ী-দের। চিঠির বক্তব্য মিথ্যা হতে পারে কিন্তু রানী দাস নামে যে কেউ ছিলেন সে প্রমাণ তো আমি পেয়েছি।

তবে? তবে এখন একটা কাজ আমার করা দরকার। জীবন দাসের মা-কে ডেকে পাঠাতে হবে। আর প্রয়োজনে নিজেকেই চলে যেতে হবে মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী থানার পরাশপুরে। যেখান থেকে রানী দাস নামে একজন নিজেকে মৃত জীবনদাসের বিবাহিতা স্ত্রী বলে দাবি করেছে। আর দাবি করেছে মৃত ব্যক্তির সমস্ত পাওনাগণ্ডার মালিকানা।

এসব কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আবারও বড়বাবুকে ডেকে পাঠালাম। বললাম—বড়বাবু এটা কেমন হ'ল? পুষ্প দাস বলে গেল তার শাশুড়িকে নিয়ে আসছে পরদিনই। কিন্তু এল না। দেখলেন আমি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আপনি তো বুদ্ধি করে তাদের চিঠি পাঠাবেন। এদিকে সবার ধারনা হচ্ছে আমরা অকারণে হ্যারাস্ করছি। এতো ঠিক কথা নয়। যান তাড়াতাড়ি চিঠি করে আনুন।

বড়বাবু বের হয়ে গেলেন। আমি মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম। তোমরা কাজ আটকে রাখবে আর আমি

খাব গালাগাল? অফিসার হয়েছি বলে কি মহা অপরাধ করেছি নাকি?

—অপরাধ নেবেন না স্যার। এই নিন চিঠি। টাইপ কপি। বড়বাবু জানান।

আমি সই করি। বলি—কাইন্ডলি দেখবেন যেন কালই ওদের হিয়ারিংটা শেষ করে ফেলতে পারি। অন্য কোন কাজ রাখবেন না কালকে।

কিন্তু আমি হিয়ারিংটা শেষ করে ফেলব, শেষ করে ফেলতে পারি বললেই কি আর সব শেষ হয়ে যাবে নাকি? নাকি তা' কোনদিনও কখনও হয়েছে? বিশেষ করে যেখানে অফিসের সবাই হাজির হয় এক বৃদ্ধার কান্না জড়ানো কথা শুনতে?

আমি জীবন দাসের বৃদ্ধা মাকে আশ্বস্ত করি। তাঁকে জল খেতে দিই। বলি—মা! আপনি চিন্তা করবেন না। এইতো আমরা সবাই আছি। আপনার ভয়ের কিছু নেই। আমরা শুনব। আমরা আপনার সব কথাই শুনব। সব কাজ ফেলে রেখেও আপনার কথা শুনব। আপনি নির্ভয়ে বলুন সব সত্যি কথা।

আমার কথা শুনে জীবন দাসের মা বোধহয় একটু ভরসা পেলেন। প্রথমে হাত তুলে আমাকে নমস্কার করলেন। তারপর দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন—বেঁচে থাকো বাবা! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তুমি এই দুঃখী মেয়েটাকে দেখ বাবা। আমার এই বউটা কী কষ্টই না করেছে। কী দুর্ভোগটাই না ভুগছে এখনও। দেখছ তো ঐ ছেলেটাকে, মার কোল ছাড়া একটুও নড়বার ক্ষমতাই নেই ওর। আর এই যে এত কটা কাচ্চাবাচ্চা। ক'টাকে সামলাবে বেচারী!

—কিন্তু এর জন্যে দায়ী তো মা আপনার ছেলেই। আমি বেফাঁস বলেই ফেলি।

—হ্যাঁ বাবা, আমিও তো তাই বলেছি।—আমার ছেলের জন্যেই

তো বৌ তোমার এই অশান্তি আর কষ্ট। আর সেজন্যে বৌ আমার ছেলের সব টাকাকড়ি তোরই পাওনা। জীবন দাসের বৃদ্ধা মা হাতজোড় করে বলেন।

—কিন্তু মা আপনার কথা আমি না হয় শুনলাম। কিন্তু আইন তো মা বুঝবেনা। বিশেষ করে বলি আপনাকে। রানী দাস বলে একজন মহিলা নিজেকে জীবন দাসের বৌ বলে দাবি করেছেন। দাবি করেছেন সব টাকাকড়ি। আপনি এ বিষয়ে কিছু জানেন ?

আমি ধীরে ধীরে আমার কথা শেষ করলাম। দেখলাম প্রথম দিনের মতো কেউ আর আমাকে বাধা দিল না। কেউ কাঁদিল না কিন্তু ঘরে যেন এক অস্বাভাবিক নীরবতা বিরাজ করতে লাগল।

আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল। ভাবলাম—কেমন হে তুমি জীবন দাস ? নিজে মরেছ আর একদিকে অন্যদেরও মারছ। বাঃ বেশ !

কিন্তু আমাকে আর এসব ভেবে নিজেকে বেশিক্ষণ কষ্ট দিতে হল না। দেখি জীবন দাসের বৃদ্ধা মা আবার কিছু বলার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন—বুঝলেন বাবা! এই যে পুষ্প, আমার বৌ। বড় ভাল মেয়ে। আজকাল এমন বুড়িকে কেউ দেখে ? কেউ খেতে দেয়, সেবাযত্ন করে ? এ করে। আর ঐ যে মেয়েটা ? ওর সিঁথিতে সিঁদুরের টিপ এল কোথা থেকে ? পুষ্প বিয়ে দিলে। আর ঐ যে ছেলেটা পুষ্পর কোলে সারাক্ষণ লেপটে রয়েছে, আর ঐ যে দুটো ডাগর মেয়ে ওদের বিয়ে এখনই দিতে হবে। কে করবে এসব ? দেখবে করবে ঐ পুষ্প। কিন্তু পুষ্প ওদের কে ? বলুন না আপনারা ? জানেন পুষ্প ওদের কে ?

জীবন দাসের মা-র এসব কথা শুনে ঘরে এক কলগুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। য়ুনিয়নের অনেক কর্তাব্যক্তিই দেখি ঘর থেকে তখন

যেন পালাতে পারলে বাঁচেন। আমি মনে মনে আমোদ পাই। আমার পেছনে লাগা? এবার মজা দেখো দাদারা।

আমি তাই উসকে দিতে চাইলাম বুড়িমাকে। বললাম—এসব ঘরের কথা আমরা কি করে জানব মা?

জীবন দাসের মা এবার গালে হাত দেন—ওমা! তাই বুঝি? শোনো তবে বলি। এরা পুষ্পের পেটের নয়গো। এদের পেটে ধরেছিল রানী। কিন্তু যেই না ঐ নুলো ছেলেটো জন্মালে রানী তাকে আঁতুড়ে ফেলেই পালালে …। পালালো তো পালালোই। তার আর দেখা নেই। তারপর? তারপর আবার কি? জীবনের তখন পাগল-পাগল অবস্থা। মা-হারা ক'টা ছেলেমেয়ে। কে তাদের দেখে, কেইবা তাদের খাবার দেয়? ওদিকে অফিস। নুলো ছেলে।

…জীবন দাসের মা বলে চলছিলেন।—কিন্তু প্রথম বে-করা বৌ মানে সেই রানীর কোন খবর পেলেন না আপনারা? আমি আইনের পথ খুঁজে বেড়াই।

—কি হবে বাবা তার খবর নিয়ে? যে বৌ যে মা তার ঘর ছাড়ে, পেটের বাচ্চাকে ফেলে যায়, কেউ কি তার খোঁজ করে?

—না মা। আমি তা' বলছি না। পুষ্পকে বিয়ে করার আগে আপনার ছেলে কি দেখে নেয়নি যে রানী বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে? নাকি অন্য কোথাও ঘর বেঁধেছে?

—না বাবা, আমাদের কারোরই মনের তখন সে অবস্থা ছিল না। আমরা বাঁচতে চাইছিলাম। বাচ্চাগুলোকে বাঁচাতে চাইছিলাম। যে নিজে থেকে চলে গিয়েছে আমরা তাকে আর চাইনি। আমরা তাকে ভুলতে চেয়েছি।

—কিন্তু মা! সেও তো আপনার ঘরের লক্ষ্মী ছিল একদিন। সে জলে ডুবে মরল না রেলে মাথা দিল সে খবর করবেন না আপনারা?

—না বাবা বালাই ষাট! ওরকম অলুক্ষণে কথা বলছ কেন?

ওরকম কোন খবরই আমাদের কেউ দেয়নি। তাই মনে হয় যে সে বেঁচেই আছে। আছে কোথায়ও!

—আপনার কথাতো শুনলাম মা। কিন্তু আপনার ছেলে ছিল সরকারি কর্মচারী। এক বৌ বেঁচে থাকতে সে তো আর একজনকে বিয়ে করতে পারে না। আমি আইনের কথাটা জানিয়ে দিই।

অফিসের সবাই জানলে এবং বুঝলে যে জীবনের সংসার আবারও ছারখার হতে চলেছে। পুষ্প তার আইন মোতাবেক বৌ না হতে পারে কিন্তু সেইতো এতদিন জীবনের ছেলেপুলে আর মা-কে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাদের মধ্যে দিয়েই বেঁচেছিল জীবনের সংসার। কিন্তু আর বাঁচা গেল না। জীবনের সংসার ডুবল বোধ হয়।

আমার কথা শুনে জীবনের মা কী বুঝলেন কে জানে। কিন্তু ঘরের সবাইকে গম্ভীর মুখে উঠে যেতে দেখে অমঙ্গল আশঙ্কায় বুড়িমা আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছলেন।

কিন্তু তবুও কী অসীম ধৈর্য্য জীবনের মা-র। আমাকে তিনি বোঝাবেনই। বললেন—বাবা সব বুঝলাম আপনার কথা। কিন্তু এ যে এদের মা। আসল মা। ধাত্রীমা। এর কি কোন দাম নেই আইনের বইয়ে? মানুষ তবে কেন এমন আইন করেছে যেখানে এমন মা কোন দাম পায় না? আমি শুধু মা হয়ে বলব আমার চোখের জল মুছে যায় এমন কিছু পথ দেখাও।

জীবনের মা, পুষ্প আর জীবনের ছেলেমেয়েরা একের পর এক আমার চেম্বার থেকে বের হয়ে গেল। তারপর আমার অফিসের লোকজনও একে একে বের হওয়া শুরু করলেন।

বড়বাবুও বের হচ্ছিলেন। আমি হাতের ইশারায় ওঁকে একটু থাকতে বললাম। বড়বাবু তাই বের হতে গিয়েও বের হলেন না।

সবাই চলে গেল। এবার আমি বড়বাবুকে কিছু কথা বলতে চাইছিলাম। কিন্তু তাতেও এক ফ্যাকড়া। য়ুনিয়নের কর্তাব্যক্তিরা

আবারও এসে হাজির। বললেন—স্যার, কিছু মনে করবেন না। আমরা আগে সবকথা সঠিক জানতে পারিনি। বেআইনী আপনাকে আমরা কিছু করতে বলব না। শুধু দেখবেন স্যার সংসারটা যেন বাঁচে।

আমি বললাম—সে বিষয়ে আমি চেষ্টা করব এটুকুই কেবল বলতে পারি।

ওঁরা নমস্কার করে চলে গেলেন। আমি বললাম—বড়বাবু এবার একটু চা-টা খাওয়া যাক। বড় ধকল গেল সারাদিন আজ।

টিফিন খেতে খেতে আমি আমাদের ল'অফিসার নন্দীসাহেবের সঙ্গে কথা বলে নেব ঠিক করলাম। আইনের কোনও ফাঁকটাক আছে কী-না জানা দরকার।

কিন্তু নন্দীসাহেবও হতাশ করলেন আমায়। একটু ঠাট্টা করলেন প্রথমে। পরে হেসে বললেন—না ভায়া। সেকেণ্ড ওয়াইফের কোন লিগ্যাল স্ট্যাটাসই নেই। তার ওপর প্রথম বৌ বেঁচে। সেই অভিযোগকারিণী।

আমি ক্ষীণস্বরে বলি -স্যার যদি অপরাধ না নেন একটা কথা বলি ?

—বলো। কি বলতে চাও। নন্দীসাহেব রায় দেন।

—স্যার একজন ইয়ং লেডি। রানী। সে কতদিন বিয়ে না করে থাকবে ? থাকতে পারে ? এরমধ্যে যদি সে বিয়ে করে থাকে তবে সেক্ষেত্রে কি পুষ্পর দাবি গ্রাহ্য হবে না ? তাছাড়া জীবনের নাবালক, ছেলেমেয়েরাতো বাপের টাকা কিছু না কিছু পাবেই। আমার সমস্যা হচ্ছে পুওর পুষ্পকে নিয়ে। একটা মেয়ে সব দিলে আর তার বদলে পাবে সবার ঘেন্না ? দাসীর মর্যাদা ! —বলতে বলতে আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম বোধহয়।

—ওহো মাই ডিয়ার বয় ! ডোণ্ট বী সো এক্সাইটেড্। দ্যাখো

তুমি যদি প্রমাণ আনতে পার যে ঐ মেয়েটা মানে জীবনের আগের বৌটা পুষ্প প্রথমবার কনসিভ করার আগেই মারা গেছে বা অন্য জায়গায় বিয়ে করেছে তবে সেক্ষেত্রে পুষ্পকে জীবনের বৌ-র মর্যাদা দেবার বিষয়টি আমি ভেবে দেখব। নাউ মাই ডিয়ার রায় গুডবাই। —বলেই ফোন নামিয়ে রাখলেন নন্দীসাহেব।

কিন্তু নন্দীসাহেবের কথাটা আমার আগের চিন্তাকেই যেন আবার ফিরিয়ে আনল। আমি অনেক আগেই ভেবেছিলাম যে প্রয়োজনে আমি নিজেই চলে যাব জলঙ্গী। খুঁজে বের করব রানী-কে।

ব্যাস্‌ যে কথা সেই কাজ। তাছাড়া বহরমপুর আমার পুরনো জায়গা। ছেলেবেলায় একসময় ছিলাম ওখানে। বাবার চাকরিস্থল। স্কুল জীবনের বন্ধুরা আছে। তাদের সঙ্গে অল্পস্বল্প যোগাযোগও আছে।

আমি তাই তপনকেই ফোন করে দিলাম। বললাম—আসছি। ভাগীরথী ধরে। স্টেশনে থাকিস্‌। পরে বলব সবকথা।

শুধু তপন কেন ? স্টেশনে আরও অনেকেই হাজির। হারু। মণ্টু। সমীর। আবদুল। সফর। অনেকদিন পরে ওদের দেখে আমারও খুব আনন্দ হল। সবারই ইচ্ছে ক'দিন থেকে যাই। কিন্তু আমার সে উপায় কোথায় ? শনিবার নিয়ে দুটো ছুটির দিন। এরমধ্যে পরাশপুর যেতে হবে। রানীকে খুঁজে বের করতে হবে। আর গোপনে আমার খবরটা জোগাড় করতে হবে।

তা ওরা সবাই মিলে খুব সাহায্য করলে আমায়। একটা গাড়িও পাওয়া গেল। তবে সমীর সঙ্গী হল আমার। আর কপালও ভাল বলতে হয় আমার।

বি এস এফ ক্যাম্পের কাছেই পরাশপুর। একটু দূরে পদ্মানদী বয়ে চলেছে। কিছু চড়া পড়েছে। সন্ধ্যায় নাকি

রাজশাহী শহর স্পষ্ট দেখা যায়। আমি ওসব শুনেও শুনলাম না। আমার তখন দরকার রানীকে! সে এখন কোথায়? কি করছে সে?

সমীর আর আমাকে রানীর বিষয়ে খোঁজ করতে দেখে একজন ভদ্রমতো লোক এগিয়ে এলেন। আমাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেললেন। যেন আমাদের মতিগতি উদ্দেশ্য মেপে দেখবেন। আমি অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম। সমীর কিন্তু খুব হুঁশিয়ার। সে বললে—আমরা কলকাতা থেকে আসছি। এক পুলিসী তদন্তে। রানী বলে এই ঠিকানায় কেউ থাকেন?

এবার ঐ লোকটা যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। বলল—রানী? আমি তাকে চিনি। আমার সঙ্গে আসুন।

আমরা ওর সঙ্গে অনেকটা পথ হেঁটে গেলাম। গাঁয়ের রাস্তা। হাঁটতে বড় কষ্ট হচ্ছিল। পথের দিকেই চোখ রাখছিলাম। অন্য দিকে তাকাবার অবসর পাইনি।

—রানী! একটু এদিকে এসো। ওই লোকটার গলার আওয়াজে আমার যেন হুঁশ এল।

তাকিয়ে দেখি মাঝবয়সী একজন মেয়েমানুষ বের হয়ে এল ঘর থেকে। ঘর অবশ্য মাটির। কিন্তু অতশত নজর করার সময় আমার আর তখন নেই। কেননা আমি তার কপালে সিঁদুরের টিপ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি।

মার দিয়া কেল্লা!—আমি মনে মনে ভাবি। পকেট থেকে সেই অভিযোগপত্রটা বের করি। বলি—আপনার নাম রানী? জীবন দাসের বৌ? আর এই দরখাস্ত আপনার? এই নিন্ পেন, এর নিচে সই করে দিন্।

ভদ্রমহিলা আমার কোন কথার জবাব দিলেন না। কেবল পেন নিয়ে নিচে নাম সই করলেন—রানী দাস।

আমি সইটা দেখলাম ভাল করে। ভদ্রলোককে ডাকলাম, বললাম —নিন। আপনিও নিজের নামটা লিখুন।

ভদ্রলোক হাসলেন আমার কথা শুনে। বললেন—কলমটা দিন। —বলেই নিজের নামটা লিখলেন—ঘোঁতন সরকার।

আমি বলতে গেলে চেঁচিয়েই উঠলাম—ইয়ার্কি হচ্ছে? আপনি সরকার আর আপনার বৌ দাস? চালাকি আমার সঙ্গে?

ঘোঁতন সরকার আমার কথা শুনে একটুও উত্তেজিত হ'ল না। শুধু বললে—স্যার জীবন আমার বন্ধু ছিল। তার বৌকে আমি বাঁধা রেখেছি আমার কাছে। নাহলে গাঁয়ের লোকে নিন্দে করবে যে। তাই ওর কপালে সিঁদুর। বাচ্চাও দিয়েছি একটা।

—কিন্তু এসব করে তোমার লাভ কি? শুধু শুধু আর একটা পরিবারকে কষ্ট দেওয়া।—আমি রাগ চাপতে পারি না।

—তা নয় স্যার। আমিও সরকারি কর্মচারী। আমারও পরিবার রয়েছে দেশে। মাঝে মধ্যে দেশে যাই। অনেকদূর। কিন্তু আমি মরলে রানীর কি হবে? জীবনের টাকা যে ওর খুব দরকার। রানী আর তার বাচ্চাদের খেতে পরতে হবে তো! কি বলেন? ঘোঁতন সরকার প্রশ্ন করে। কথা শেষ করে।

আমি কিন্তু আর কথা বলতে পারি না। চুপ করে যাই। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে আমার। মাথা ঘুরে বোধহয় পড়েই যেতাম। সমীর ধরল বলে বেঁচে গেলাম।

কিন্তু জীবনের সংসার? জীবন তো মরেই গেছে কবে। আর তার সংসারটাকেও আমি বাঁচাতে পারলাম না।

আইন মোতাবেক কাজই করলাম আমি। বেআইনী বেকানুনী কাজ আমি কোনদিন কখনই করি না। জীবনের সংসার বাঁচাবার দায় কি আমার? না দায়িত্ব আমার?

বাবা

পাপিয়ার কথা শুনে অবাক হতে হয়।

আসলে কলেজে উঠলে ছেলেমেয়েরা সবাই একলাফে অনেকটাই বড়ো হয়ে যায়। আর কলেজে প্রথম প্রথম যা ঘটে যা দেখে সবাই তাতো প্রত্যেকের জীবনেই নতুন। আর সে অভিজ্ঞতাও নতুন। তার ওপর গাঁয়ের ছেলে বা পাপিয়ার মতো মেয়ে শহরে পড়তে এলে এসব সম্পর্কে আর কোনও কথাই নেই। আধা শহর থেকে কোলকাতায় এসে পড়লে যে কোনও লোকেরই এমন বিচিত্র বিবিধ অভিজ্ঞতা ঘটে থাকে।

কোলকাতা এমন এক শহর যাকে চেনা বড় শক্ত। আর কোলকাতার পাঁচমিশেলি লোক তারা কখন যে কোন মতলবে থাকেন তা বুঝবে কে? কোলকাতা তো কেবল বাঙালীর একার শহর নয়। কোলকাতার ওপর দাবি কমবেশি সবারই।

কোলকাতাকে চিনতে গিয়ে কত পণ্ডিত কত ওস্তাদলোক তলিয়ে গেলেন। আর এতো সবে কলেজে-ওঠা এক মেয়ে। জেলা শহর থেকে আসা। আসলে পাপিয়া আমার ভাইঝি। আমার বড় দাদার মেয়ে। আমাদের সবারই বড় আদরের। কোলকাতার কলেজে পড়বে বলে আমার কাছে এসেই উঠেছে। আর তাই কলেজে ওঠার পর তার এক একদিনের নতুন নতুন অভিজ্ঞতার গল্প আমি আর গিন্নি মানে আমরা সবাই খুব তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি। ওর দেখার ক্ষমতা ওর সমস্ত বিষয়কে সাজিয়ে গুছিয়ে বলার দক্ষতাকে আমরা সবাই খুব প্রশংসাও করেছি।

কিন্তু সেদিন পাপিয়ার কথা শুনে আমি তো অবাক! আমি ওর মুখের দিকে তাকাই। পাপিয়া সবে তখন কলেজ থেকে ফিরেছে। মর্নিং কলেজ। কিন্তু তবুও ঘেমে নেয়ে একেবারে

অস্থির। ওর কথা আমারও না-কী না শুনলেই নয়। অথচ ওদিকে আমার অফিসের দেরি হচ্ছে।

তাই খেতে খেতে হাত মুখ ধুতে ধুতে জামা প্যাণ্ট পরতে পরতে আমি পাপিয়ার কথা শুনি। শেষে বলি—তোমার গল্পটা ভীষণ ইণ্টারেস্টিং। কিন্তু এখনতো অফিসে বেরুচ্ছি। তাড়াহুড়ো করে এমন জিনিস শোনা যায় না। মন দিয়ে শুনতে হয়। অফিস থেকে ফিরে না হয় শুনব। কেমন ?

পাপিয়া আমার কথা শুনে খুব মন দিয়ে। শেষে বলে—আচ্ছা কাকু! তোমার তো কাল ছুটি। ধরো কালকে যদি মৌ-কে নিয়ে আসি ?

—মৌ ? সে আবার কে ? ওহো তোমার সেই নতুন বন্ধু বুঝি ? আমি বলি।

—ও মা! এটা তো সেই মৌ-রই গল্প। —পাপিয়া তার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে।

—আরে বাঃ। সেতো বেশ হবে। আনোই না ওকে ? তোমার কাকীও থাকছেন তো। --বলে আমি বেরিয়ে পড়ি।

পরদিন মৌ এসেই আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। আমার গিন্নিকেও। আমি তো অবাক। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে তো এসব উঠেই গ্যাছে। এখন তো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে বলে—হাই! আর বড়দের গুরুজনদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলে বলবে—ও আণ্টি। ও আঙ্কল। —ব্যাস্ খেল খতম। আর সেখানে এ মেয়ে ? আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করি। বলি—আরে থাক্ থাক্। এসব কেন ? এসব কেন ? বেঁচে থাকো। দীর্ঘজীবী হও। পড়াশোনা ভালো হোক্। আমি অনেক কিছুই বলে ফেলি। তবুও মনে হয় কিছু যেন বলা বাকি থাকল।

ওদিকে আমার অত কথা শুনে আমার গিন্নি মুখ টিপে হাসেন।

বলেন —আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। কলেজ থেকে এসেছে একটু জলটল খেয়ে জিরোতে দাও। পরে কথা হবে।

সংসারে থাকতে গেলে শান্তি চাই। তাই আমি গিন্নির কথা চুপচাপ মেনে নি।

কিন্তু মৌ-র কথা শুনে আমার মানসিক শান্তি ভঙ্গ হয়। আমি গালে হাত দিয়ে বলি—আরে একি কথা? বলছ কি তুমি!

আমার কথা শুনে মৌ চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। ওর চোখমুখে কেমন যেন এক বিষাদের ছায়া। সতেজ, সজীব প্রাণচঞ্চল মেয়েটা আমার এক কথাতেই কেমন যেন নেতিয়ে পড়ে। কেমন যেন বিমর্ষ হয়। আমি মনে মনে ভয় পাই—আরে বাবা! মেয়েটাকে কোনও ভাবে আঘাত করে বসলামনা তো? পাপিয়া কি ভাববে শেষে? তার বন্ধুকে মানসিক নির্যাতন?

এসব কথা মনে হতেই আমি খুব হুঁশিয়ার হয়ে পড়ি। একটু আমতা আমতা করে বলি—ঠিক তা নয়। আমি বলছিলাম কী, তোমার মা কি করে তোমাদের ভাইবোনদের মানুষ করলেন? তুমি যে কাহিনী বলছ তা' যে অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য। তোমার বাবা...।

আমি কথা শেষ করতে পারি না। তীব্র এক আবেগে আমি ভেতরে ভেতরে কাঁপতে থাকি। ঘরে এক অদ্ভুত নীরবতা! শুধু আমার গিন্নি উঠে গিয়ে ফ্যানটা আরও জোরে চালিয়ে দেন। আর পাপিয়াকে বলেন—পাপিয়া চলোতো ও-ঘর থেকে সরবৎ নিয়ে আসি।

সরবতের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে মৌ বলে—কাকাবাবু, শুধু আপনি কেন? আমার মার কথা শুনে কেউ মানতেই চায়না যে আমার মার মনে এত শক্তি রয়েছে।

মৌ-র কথা শুনে আমি ওর দিকে তাকাই। মৌ-র চোখে মুখে যেন আগুন জ্বলে ওর মার ত্যাগ আর দুঃখ বেদনার কথা বলতে গিয়ে। বড় ইমোশন্যাল্ মেয়ে। পাপিয়া ওর হাতে হাত রাখে।

আমার গিন্নি উঠে এসে ওর পিঠে হাত রাখেন। সব ব্যাপারটাই এমন গোলমেলে আকার ধারণ করে যে আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই।

আসলে মেয়েদের ব্যাপার স্যাপারই বোধহয় এইরকম। আর মৌ-র মার মতোই গোলমেলে বিচিত্র তাঁদের অনেকেরই জীবন।

তবে ভাগ্য ভালো বলতে হয় আমার। ঘরের সেই নীরবতা ভেঙ্গে দিয়ে মৌ আবারও তার কথা শুরু করে—আসলে জানেন কাকাবাবু, আমার কিছুই মনে নেই। তাছাড়া মা বলতে চান না সেসব কথা। কিন্তু লোকে মা-র ওসব কথা শুনবে কেন? তারা বলে মা নাকি আমাদের মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছেন। তারা বলে আমার বাবা নাকি সেই আগুনেই পুড়ে মারা গেছেন। কেউ নাকি বাঁচেনি সেই ভয়াবহ আগুন থেকে। আমার মা অবশ্য ওদের ওসব কথা বিশ্বাসই করেন না। তিনি বলেন, এসব হচ্ছে গপ্পো। তাঁর ধারণা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর স্বামী আজো বেঁচে আছেন।

মৌ-র কথা শুনতে থাকি। মৌ খুব আবেগের সঙ্গে খুব জোর করে বলতে থাকে তার মা-র বিশ্বাসের কথা। খুব আন্তরিকতার সঙ্গে মৌ কথা বলছিল। অবশ্য আমার একটু আধটু খটকা লাগছিল। কিন্তু আমার আর সাহস হয়না কোনও প্রশ্ন করার। কী বলতে গিয়ে কি বলে বসব তখন গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। তখন ঠ্যালা সামলাও। কি দরকার বাবা ওসব ঝামেলায় গিয়ে? তার চে' অনেক ভালো চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বাদাম চিবুতে চিবুতে গম্ভীর মুখে মৌ-র কথা শোনা।

জানিনা আমার গম্ভীর মুখে কোনও ব্যথা কোনও সমবেদনার ছাপ ফুটে উঠেছিল কী-না। অতবড়ো অভিনেতা আমি নই।

কিন্তু মৌ জানায়। আমার সেই চেহারা দেখে সে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতেই বলে—কাকাবাবু! আপনি আজ আমাদের কথা শুনে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন। লোকে আমাদের দুঃখে

কাতর। এক সহায় সম্বলহীনা বিধবা মহিলা আজকের দিনে কী কষ্ট করে কী প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে থেকেও কী পরিশ্রম করে কী রকম লড়াই করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটোকে মানুষ করছেন। আমাদের কষ্টে লোকের না-কী রাতে ঘুম হয় না।

মৌ-র কথা শুনে আমার গিন্নি কাছে এগিয়ে আসেন। ওর পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে দেন।

কথা বলতে বলতে মৌ-র গলা ধরে এসেছিল। একটু থেমে নিয়ে সে আবারও বলে—আমার মা কিন্তু এসব মানেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আমার বাবা বেঁচে আছেন।

মৌ-র এসব কথা শুনে আমি একটু নড়েচড়ে বসি। আমার গিন্নি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। বলেন—তাই হোক মা। তাই হোক্। তোমার মার কথা যেন সত্যি হয়। ওঁকে আমার কথা বোল। পারলে একদিন ওঁকে নিয়েও এসোনা। আমাদের বাড়িতো চিনেই গেলে।

গিন্নির কথা শুনি। কিন্তু মৌ-র কথা আমার কানে বাজে। আমি একটু চোখ বুজি! তবে খুব অল্প সময়ের জন্যে। কেননা পাপিয়া কথা বলে আবার—কাকু চলো। খাবার রেডি। খেতে খেতে মৌ-র গল্প আরও শোনা যাবে।

আমরা টেবিলে এসে বসি। দেখি গিন্নি নতুন অতিথির জন্যে অনেক পদ করেছেন। ওসব খাবার আমারও বেশ প্রিয়। কিন্তু মৌ-র কথাতে আমি কেমন যেন এক রহস্যের গন্ধ পাই। ওর মাকেও আমার কেমন যেন এক রহস্যময়ী নারী বলে বোধ হয়।

আমি গভীর ভাবনায় জড়িয়ে পড়ি। কিন্তু এক রহস্যের জাল কাটাতে না-কাটাতেই আমি আর এক জালে আটকে পড়ি।

মৌ, তার মা তার দাদা—তিনজনের মধ্যে একজনকেই আমি দেখেছি। তাও মৌকে দেখলাম জীবনে প্রথম। আর তা' এই আজই। সাধারণ মেয়ে। অথচ এই মেয়েটার মনেই কী দৃঢ়

বিশ্বাস তার বাবার বেঁচে থাকার। কী স্থির আস্থা মার কথায়। আমাকে অবাক মানতে হয়।

কিন্তু একটু কিছু সমবেদনার কথা না বললে খারাপ দেখায়। তাই আমি বাধ্য হয়েই জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা মৌ, সেই আগুনের কথা তোমার মা কি সব সময়েই বলেন? না-কি— ?

আমাকে কথা শেষ করতে দেয় না মৌ। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়েই বলে—মা আগে ততো বলতে চাইতেন না। এখন খুব বেশি বেশি করে বলেন।

—কেন? তোমার মা এমন কেন করেন? সেই ভয়াবহ লেলিহান অগ্নিশিখা আজ কি তোমার মাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে? আচ্ছা, এখন তোমার মার মধ্যে কোনও পরিবর্তন কি নজরে পড়ে তোমার?—আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারিনা। মুখ ফসকে অনেক প্রশ্ন করে বসি একই সঙ্গে।

আমার কথা শুনে আমার গিন্নি ভুরু কোঁচকান। আমার আহাম্মকিতে তিনি কপালে হাত ঠেকালেন। পাপিয়া ঠোঁট কামড়ায়। তার অসন্তোষ জানায়। কিন্তু মৌ নির্বিকার। আশেপাশের জগতে যখন এক বিরাট আলোড়ন চলেছে সেখানে মৌ অচল অনড়। আসলে সে যেন ধরেই নিয়েছে যে এমন একটা প্রশ্ন আমার কাছ থেকে আসতেই পারে। আসা খুবই স্বাভাবিক। না আসলেই সে যেন অবাক হত। আমাকে অন্য জগতের বাসিন্দা বলে মনে করত। এরকম প্রশ্নের মুখোমুখি সে হয়তো এর আগেও অনেকবারই হয়েছে।

তাই সে এবার মিষ্টি করে একটু হাসল। সালোয়ার কামিজ পরা মেয়েটিকে তখন বেশ লাগছিল।

আমি ওর দিকে একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে ছিলাম। মৌ তা গ্রাহ্য করল না। সে শুধু বলল—কাকাবাবু, সে যে অনেক অ-নে-ক

লম্বা কাহিনী। আপনার কি সময় হবে? না আপনার ধৈর্য থাকবে? তবে আপনি যদি শুনতে চান—!

আমি মনে মনে মেয়েটির বুদ্ধির তারিফ করি। নিজেদের বাড়ির গোপন কথা কিছুতেই প্রকাশ করবে না। নেহাৎ আমরা শুনতে চাইছি তাই সে বলছে।

তবে আমিও একটু চালাকি করি। তাই বলি —আরে সে কি কথা? তুমি বলবে কষ্ট করে আর আমরা শুনবো না? তা-ও কি কখনো হয়? চলোইনা। খাওয়া তো শেষ। এবার তোমার কথা শুনতে শুনতেই সময়টা আমাদের বেশ কেটে যাবে।—আমি চেষ্টা করি সমস্ত পরিবেশটাকে সহজ আর হাল্কা করার।

মৌ আমার কথা শোনে। সবার দিকে তাকায়। আমরা বাইরের ঘরের সোফায় এসে বসি। গা ছড়িয়ে দেই। আর মৌ এবার নতুন উদ্যমে তার লম্বা কাহিনী শোনাতে বসে। তবে সে যেভাবে শুরু করল তাতে আমার অন্ততঃ মনে হল যে সে এভাবে আর এই স্টাইলেই তার কাহিনী অনেকবারই অনেককে শুনিয়েছে।

মৌ বলল: মা বলেছেন, বাবা নাকি বুঝতেই পারেননি যে আমাদের বাড়িতে আগুন লেগেছে। শুধু আমাদেরটাই নয় কেবল, আশেপাশের আরও ক'টা বাড়িতেও আগুন তখন জ্বলছিল দাউ দাউ করে। গাঁয়ের লোক দৌড়ে এসেছিল। হৈচৈ হয়েছিল, কিন্তু অতবড়ো আগুনের সঙ্গে কি আর লড়াই করা যায় ক'টা হাঁড়ি কলসী বালতি দিয়ে? না-কি আধমাইল দূরের পুকুর থেকে জল এনে? তাই দেখতে দেখতে সব বাড়ি চোখের সামনে ছাই হয়ে গেল। ক'টা গোরু ছাগল মারা পড়ল। মানুষও ক'জন। গাঁয়ের কলের সামান্য জল বাঁচাতে পারল না কাউকেই। অথচ লোকে বলত বাবা ছিলেন সৎ আর নির্ভীক লোক। কোথাও একটু অন্যায় আর অবিচার দেখলেই তিনি তার প্রতিবাদ করতেন। তাই একদল দুষ্টু লোক এভাবেই বদলা নিল। সিনেমায় অনেক সময় এমন দেখা

যায়। আমরা সত্যি সত্যিই পথে বসলাম। আকাশ হল আমাদের বাড়ির ছাদ। আমার মামারা থাকতেন পাশের গাঁয়ে। তাঁরা দৌড়ে এলেন খবর পেয়ে। কিন্তু মা কারো কাছে হাত পাতেননি। কারো সাহায্য নেননি। নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল তাঁর। অগাধ আস্থা ছিল তাঁর নিজের ওপর। মা বলতেন, বুঝলি মৌ বুঝলি মধু একদিন তোদের বাবা ফিরে আসবেন। কিন্তু এখানে আমরা পড়ে থাকলে তিনি তো আর আসতে পারবেন না। ওই বদগুলো ওই বদমাশ লোকেরা তাঁকে আবারও খুনের ষড়যন্ত্র করবে। ঘোঁট পাকাবে। আমি তাই ওখান থেকে সরে এলাম। তোদের নিয়ে দূরেই চলে এলাম।

—তারপর? তারপর কি হল?—প্রশ্ন না করায় খারাপ দেখায়। বিশেষ করে মৌ যখন এত কথা বলছে। তাই আমি আগ্রহ দেখাতে প্রশ্ন করি।

—মা বললেন কি আর বলব বল তোদের। সবই আমার অদৃষ্ট। পোড়া কপাল! কত ফটো ছিল তোদের। তোর বাবার সঙ্গে। সবতো পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তোদের বাবার একটাও ফটো নেই। তুই কোলে, মধুটা তখন একটু একটু হাঁটতে শিখেছে। কত ফটো তুলে ছিলেন তোদের নিয়ে আমাকে নিয়ে স্টুডিওতে গিয়ে। কিন্তু সব গেল। অবশ্য তিনি তো আর এখন ওই বেশে আসতে পারবেন না। তিনি তো এখন সন্ন্যাসী হয়ে রয়েছেন। না হলে ওই বদমাশদের হাত থেকে বাঁচবেন কি করে?

মৌ-র কথা আমাদের সবারই হৃদয় স্পর্শ করে। বুঝতে পারি কেন পাপিয়া ওর কথায় এত মুগ্ধ হয়েছে। এত অভিভূত হয়েছে। আমার গিন্নি আবার বড়ো ভালোমানুষ। তিনি মৌ-র দুঃখে কাতর হন। গলে পড়েন। আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছেন।

এসব কথা শোনার পর শ্রোতাদের মানসিক অবস্থা দেখার পর যে কোনও লোকেরই মন কাতর হবে। দুঃখে ভরে যাবে। কিন্তু

আমি লোকটাই বোধহয় একটু গণ্ডগোলের। তাই আমি এবার খুব মেপেঝুঁকে অতি সাবধানে এক বোকা বোকা প্রশ্ন করি —আচ্ছা ধরো, তোমার বাবা যদি হঠাৎ চলে আসেন—ধরো ঐ সন্ন্যাসীর বেশেই, তখন? তখন কেমন মজা হবে? আচ্ছা তখন তোমরা, মানে তোমরা, মানে তোমার মা, চিনতে পারবেন তোমার বাবাকে?

আমার কথা শুনে মৌ গালে হাত দেয়। পাপিয়া আর আমার গিন্নি হেসে ফেলে। আর মৌ এমনভাবে তাকায় আমার দিকে যে সে যেন ভাবতেই পারে না যে আমি তাকে এ প্রশ্ন করতে পারি। কেননা তার হাবভাব দেখে মনে হল আমার মতো এরকম বোকা বোকা প্রশ্ন তাকে আর কোনও দিনও কেউ করেনি। কতজনা কেই না সে তার বাবার কথা বলেছে।...আরে বলেন কি কাকাবাবু? মা চিনবে না বাবাকে? তা যেভাবেই যেরূপেই তিনি আসুন না কেন মা তাঁকে ঠিকই চিনতে পারবেন। আরে মা-তো তাঁর সেই তপস্যাই করে চলেছেন। তিনি সধবার বেশে আজও আছেন কেন? বাবা যে তাঁর মনে এখনও রয়েছেন। জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক।

আসলে মৌ আমাকে ওরকম কথাই জানায়—সত্যি বলছি কাকাবাবু! মা-কে না দেখলে আপনি বুঝবেন না মা-র শক্তি কতটা। মা জানেন বাবা তাঁকে ফেলে যেতেই পারবেন না। মা'র জীবনের সুখ মায়ের জীবনের সাধ তার আহ্লাদ সব সবকিছুই বাবাই যে পূর্ণ করবেন। মা-তো সেই প্রতীক্ষাতেই রয়েছেন আজও। মা জানেন তাঁর এই তপস্যা একদিন না একদিন শেষ হবেই।

মৌ-র কথা আমরা সবাই শুনি। আমার গিন্নি তো মৌ'র মা-র প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমন সতী সাধ্বীর সাধনা কি বিফলে যেতে পারে? তাই তিনি বলেন—মৌ আমিও বিশ্বাস করছি তোমার বাবাকে একদিন তোমরা পাবেই। তিনি আসবেনই। তোমার মার বিশ্বাস মিথ্যা হবে না।

কথা বলতে বলতে গিন্নি মৌ-কে নিজের বুকে টেনে নেন।

এরপর আমাকেও কিছু বলতেই হয়। আমি বলি—হ্যাঁ মৌ। আমার মনে হচ্ছে বাবাকে তোমরা পাবেই।

আমাদের কথা শুনে মৌ-র চোখে জল আসে। সে আমাদের দু'জনকেই প্রণাম করে। কাকীমার বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে পাপিয়াকে এবার জড়িয়ে ধরে মৌ।

এবার ওরা ধীরে ধীরে বাইরের দরজার দিকে পা বাড়ায়। আর একসময় আমাদের ফুলের বাগানকে দুপাশে রেখে গেটের দিকে এগিয়ে যায়। মৌ পেছন ফিরে তাকায়। হাত নাড়ে। আমরাও হাত তুলি।

পাপিয়া এবার বন্ধুকে বাস রাস্তা পর্যন্ত একটু এগিয়ে দিয়ে আসে। মৌ আর ও চুপচাপ পথ চলছে আমরা দূর থেকে দেখতে পাই।

পাপিয়া ফিরে আসে অল্প সময়ের মধ্যেই। ওর বন্ধুর জীবনের দুঃখ বেদনার কথা ওর নরম মনকে হৃদয়কেও স্পর্শ করেছে গভীর ভাবে।

তাই আমি আর কথা বাড়াই না। চুপচাপ হয়ে যাই। কিন্তু মনটা কেমন যেন খিচ্ খিচ্ করে। আসলে আমি পুলিশের লোক। সব ব্যাপারেই খুঁত ধরা সন্দেহ প্রকাশ করা আমার এক স্বভাব। আসলে সমস্ত বিষয়কে তলিয়ে না দেখে খতিয়ে পর্যালোচনা না করে আমি ঠিক শান্তি পাইনা। তবে পাপিয়া আর মৌ! আমি চিন্তা করি। অনেক ভেবে মৌ-র ব্যাপারে আমি তখনকার মতো চুপ করে যাই।

কিন্তু কপাল! ক'দিন বাদেই মুখ খুলতে হয় আমায়। আমি অফিস থেকে ফিরতেই পাপিয়া লাফিয়ে আসে। বলে—কাকু আজ এত দেরি করলে ফিরতে? তোমায় এক দারুণ খবর দেব বলে সেই কখন থেকে যে ছট্‌ফট্ করছি।

আমি বলি—ওই দেরি হল আর কী! একটু কাজ পড়ে গেল। তা এমন কি খবর তোমার আবার? ফোনেও তো জানাতে পারতে।

—না কাকু ফোনে বলার কথা নয়। নিজের কানে বেশ আয়েস

করে শুনতে হয়। তাছাড়া ফোনে তোমায় পাইনি। তাড়াতাড়ি আসতে বলব ভেবেছিলাম। পাপিয়া অনেক কথা বলে।

—আরে কি সেই খবর বলোইনা! আমি তাড়া লাগাই।

—মৌ-র বাবা এসেছেন।

—মৌ'র বাবা? এসেছেন? বাঃ খুব ভালো খবর তো।

—বলো এ খবর কি আর ফোনে দেওয়া যায়?

—তা ঠিক। আচ্ছা মৌ তার ভাই মধু—তারা বাবাকে চিনতে পারলে?

—না, না তারা পারবে কেন? মৌ-র মা। তিনিই তো চিনেছেন। সবাইকে চিনিয়েছেনও। না হলে কি চেনা যায়? ওর বাবাতো সেই এক সন্ন্যাসীর ধড়াচুড়ো পরেই এসেছেন কী-না!

—সন্ন্যাসীর ধড়াচুড়ো পরে? বলিস কিরে? আমি বেশ অবাক হই।

—বাঃ, ওর মা-তো তেমনই ভেবেছেন না? বলেও এসেছেন না এতদিন? পাপিয়া মনে করিয়ে দেয় আমাকে।

আমার মনে পড়ে। বলি—ওহো এখন মনে পড়েছে বটে। এদিকে মৌ-র বাবার ফিরে আসার খবরে আমার গিন্নিও দেখলাম বেশ খুশি। বললেন—মৌ'র মা-র সতীত্বের জোর আছে বটে। স্বামীকে টেনে আনলে বটে! এমন বড়ো একটা দেখা যায় না আজকাল।

আমি আমার সরল সাধাসিধে নিপাট ভালোমানুষ গিন্নির দিকে তাকাই। কিছু কথা বলি না। শুধু বলি—হুঃ।

আমার জবাব শুনে আমার গিন্নি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকান। তারপর মুখঝামটা দিয়ে বলেন—এই তোমার এক রোগ! সব তাতেই নাক সিঁটকানো। সন্দেহ প্রকাশ করা। এমন একটা ভাল খবর। অথচ—।

—অথচ আমার তাতে আনন্দ নেই। তোমার সঙ্গে কালীবাড়িতে গিয়ে পুজো দেওয়া নেই। তাইতো? —আমি পাদপূরণ করি।

গিন্নি আর কিছু বলেন না। আমি জানি ওঁর আর কিছু বলার নেই। এর বেশি কথা উনি কোনও দিনও বলেন নি। তা একটু পরেই আমাকে চা জলখাবার দিয়ে উনি টি-ভি দেখতে বসে যান। এইটুকুনই ওঁর খালি সময়। ছেলের ফাইন্যাল পরীক্ষা। সে মাষ্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে গিয়েছে। পড়া ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত। অন্য কিছুতে তার আগ্রহ নেই এখন।

আমার ভালই হয়। তাড়াতাড়ি খেয়ে নেই। এবার এক উঠতি গোয়েন্দাকে ফোন করি—হ্যালো দিলু! গুড। শোনো, কাল সকালে ফার্স্ট আওয়ারেই তুমি আমার অফিসে চলে আসবে।

দিলু খুব ভালো ছেলে। কিন্তু একজন সাধারণ বাঙালীর মতোই দেখতে। কেউ ওকে দেখলে বুঝতেই পারবে না যে ও কোনও কিছুর দিকে নজর রাখছে। কোনও তথ্য জোগাড় করছে। আর এই সাধারণত্বের জোরেই দিলু সব অসাধারণ কাজ করে বেড়ায়।

দিলুকে আমি আমার মনের মতো করে কেসটা বুঝিয়ে দেই। দিলু ঘাড় নেড়ে জানায় যে সে বুঝেছে। এবার আমি দিলুকে বলি তুমি আগামী দিন পনেরো মৌ-র মা আর ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুরের ওপর নজর রাখবে। আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। কোলকাতা বিরাট শহর। এখানে কেউ কাউকে চেনে না। ছোট শহরে বা গাঁয়ে মোটামুটি সবাই সবার পরিচিত। অজানা অপরিচিত লোক সেখানে ধরা সহজ। কিন্তু কোলকাতায় তা' সহজে সম্ভব নয়। যাক্ আমার মনে হচ্ছে সন্ন্যাসীর ভেক ধরে কোনও ক্রিমিন্যাল থাকতে পারে। অবশ্য এ আমার ধারণা। তুমি নিজের মতো করে এগোবে। পনেরো দিন, হ্যাঁ ঠিক পনেরো দিন বাদে, তুমি আমাকে রিপোর্ট দেবে। রিপোর্ট করবে। এর মাঝে কোনও খবর দরকার নেই।

এদিকে পাপিয়া আর তার কাকীমা গিয়ে মৌ-র সন্ন্যাসী বাবার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। দীর্ঘদিন হিমালয়ে কাটিয়েছেন।

ওনাকে নাকি সব সময় পাওয়া যায় না। ঘর বন্ধ করে থাকেন। ঐ সন্ধ্যার দিকেই কেবল একটু বের হন। এসব কথা শুনে আমার খুব কৌতূহল হয়। আগ্রহ জন্মায়। এত লুকোছাপা কেন? আমার মনে সন্দেহের কালো ছায়া আবারও রেখাপাত করে। আমি ঘন ঘন ঘাড় নাড়তে থাকি।

—বাঃ! একি বোকার মত কথা বলছ তুমি? এই লোকালয় এই ভিড় ওঁর এখন আর পছন্দ নয়। হিমালয়ে ছিলেন। এখন উনি নির্জনতা চান। মৌ-র মা বললেন, সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ করিয়ে তিনি স্বামীকে আবার সংসার ধর্মে ফেরাবেন। তাঁর সাধনার জোরে তিনি তো স্বামীকে ফিরে পেয়েছেন। এবার শুরু করবেন আরও কঠোর এক তপস্যা! তবে এখানে নয়। এই বাড়িতে নয়। মৌ আর মধুও নাকি মা-র কথায় একবাক্যে রাজি। সন্ন্যাসীকে নয়—তারা বাবা চায়। আমার গিন্নি সুযোগ পেয়ে অনেক কথা জানান।

আমি আর কথা বাড়াই না। চুপ করে থাকি। কেননা আগামীকালই তো দিলু আসবে। মৌ তার বাবা পাবে কী-না সে সমস্যার জট খুলবে কালই।

দিলু এল ঠিক সময়েই। কিন্তু ও যেন ভীষণ উত্তেজিত। আমি বললাম—এত দৌড়ঝাপ করে আসার দরকার ছিল না। সুস্থির হয়ে বোসো তো। জল খাও। চা খাও খাবার খাও। তারপর বলো।

দিলু বলে—দাদা সেসব পরে হবে'খন। আগে আপনাকে সব কথা না বলতে পারলে আমার শান্তি হচ্ছে না। এখুনিই ব্যবস্থা নিন। একটা প্রাণকে বাঁচান। একটা সংসারকে বাঁচান।

দিলুর কথা শুনে আমি তো অবাক। দিলু কি এমন রহস্য ভেদ করল। —আরে এসব আবার কি কথা বলছ তুমি? সব গোলমেলে ব্যাপার। —আমি বলি।

—দাদা শুনুন তাহ'লে। ঐ সন্ন্যাসী আসলে সন্ন্যাসীই নয়।

—তবে? তবে কে? আমি যা সন্দেহ করেছিলাম তাই?

—না দাদা। তার চেয়েও মারাত্মক! দিল্লু জবাব দেয়।

—আরে বল কি? আমি নড়েচড়ে বসি।

—আসলে ভদ্রলোক মৌ-র মা'র ছোটবেলার বন্ধু। বন্ধুর থেকেও বেশি ছিলেন। বয় ফ্রেণ্ড। এক গাঁয়েই বাড়ি। এক্কা দোক্কা খেলা। চোর পুলিশ খেলা। পুকুরে সাঁতার কাটা। কুলগাছের কুল পাড়া। আম জামরুল লিচু বাগানে ফল চুরি। ওদের বিয়ে হবারও কথা ছিল। কিন্তু হতে পারেনি। শুধু গরীব-বড়লোক নয়। ভিন্ন জাতে বিয়ে দিতে মৌ-র দাদুর আপত্তি ছিল। এদিকে মৌ-র বাবা মারা যাবার পর ওরা তো নানান জায়গায় ঘুরে ফিরে কিছুদিন হ'ল এখানে আস্তানা গেড়েছেন। মৌ-র মা সেলস-এর কাজ করেন। যখন যে কোম্পানী সুবিধা হয় সেখানেই। ব্যাস্ এরকম ঘুরতে ঘুরতেই তাঁর ছোটবেলার সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তিনি তো বিয়ে-থা করে ঘোরতর সংসারী। একটাই মেয়ে। বিয়েও দিয়েছেন। ঘরে কেবল এক ভালোমানুষ বৌ। মৌ-র মা'র মতলব বন্ধুকে নিয়ে নিজের ঘরে তুলবেন। নিজের কামনা বাসনা মিটিয়ে নেবেন। তিনি সধবা সেজে থাকেন। তাঁর স্বামীকে এখানকার কেউ দেখেনি। ছেলেমেয়েরাও নয়। এমন সুযোগ কে হারায়? বন্ধু দোনামনা ছিল। ব্যাস্ এবার তিনি বন্ধুকে বাধ্য করালেন সন্ন্যাসীবাবা সাজতে। বাবাদের কেউ সন্দেহ করে না। দারুন সুবিধা। মৌ-র মা'র গল্প মিলে গেল। সতীমার সাধনা! —দিল্লু সবিস্তারে তার তদন্ত বিবরণ পেশ করে।

—কিন্তু তুমি যে একটা প্রাণ বাঁচানো একটা সংসার বাঁচানোর কথা বলেছিলে। সেটা কি? আমি মনে করাই।

—বুঝলেন না? বন্ধুটি দুই জায়গায় সামাল দিতে পারছেন না। কতদিন আর অফিসের কাজে ট্যুরে যাচ্ছেন বলতে পারেন? বৌ মাঝেমধ্যে সঙ্গে যেতে চাইছে।

—তারপর? ওদের গেম প্ল্যান কিছু জানতে পারলে?

—দাদা আমি তো ওদের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থেকেছি। সন্ন্যাসী আর মধু ছাড়া ওদের বাড়িতে অন্য কোনও পুরুষ মানুষ নেই। মধু আর মৌ বাড়িতে থাকে না। ওরা কলেজে যায়। তাছাড়া প্রাইভেটে পড়ায়। ব্যাস্, সেই ফাঁকে বন্ধু ভদ্রলোকটি বাড়িতে ঢোকেন। ঘর বন্ধ করেন। আর সন্ন্যাসী বাবার বেশ ধরেন।

—আরে এতো দারুণ কান্ড হে! বিরাট খবর! আমি প্রশংসা করি উঠতি গোয়েন্দাকে।

—শেষটা শুনুন দাদা। মৌ'র মা সেদিন রেস্টুরেণ্টে খেতে খেতে ওনাকে বললেন—আর নয় এই অভিনয়। ছেলেমেয়েরা তো তোমাকেই বাবা বলে মেনে নিয়েছে। আমি তোমাকে নিয়ে অন্য কোথাও ঘর বাঁধব। তোমাকে এই বাবার খোলস আর পরে থাকতে দেব না। তুমি ওদের বাবা হবে। আমার স্বামী।

—আরে ব্যাস্! মৌ-র মা'র পেটে এত বুদ্ধি?

—ভদ্রলোক খুব আমতা আমতা করেন। বলেন, মিনু মানে আমার বৌটার কি হবে? মৌ-র মা বলেন, ওকে মেরে ফেলব তেমন দরকার হলে। তোমরা দীঘায় বেড়াতে যাবে। দু'জনেই সমুদ্রে ভেসে যাবে। মিনু মারা যাবে। তুমি বেঁচে উঠবে সন্ন্যাসীবাবা হয়ে। তাছাড়া তেমন দরকার হলে মিনুর স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছাড়বেন। আমার স্বামী হবেন এসে।

—এ-কী সাংঘাতিক কথা বলছ তুমি? —আমি আঁতকে উঠি।

—তাই বলছিলাম স্যার। একটা প্রাণ আর একটা সংসার বাঁচান স্যার! দিলু মিনতি করে।

—দেখছি। একটু দাঁড়াও। ভেবে দেখি কী করা যায়?

দিলু এবার একটু যেন আশ্বস্ত হয় আমার কথায়। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়। খুব খেটেছে বেচারী! আমি ভাবি। কত খবরই না জোগাড় করেছে।

এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠে। পাপিয়ার গলা। দারুণ

উত্তেজিত সে। বলে—কাকু! জানো কাকু, মৌ কলেজ ছেড়ে দিয়েছে। ওরা মানে ওর মা বাবা ভাই সব কোথায় যেন যাবে।

আমি ভাবছিলাম এমনই একটা কিছু হতে যাচ্ছে। দিলুও তো সেই রকমই আভাষ দিয়েছিল এখনই। আমি তাই খুব একটা অবাক হইনি। তবে এত তাড়াতাড়ি ঘটনাটা ঘটবে ধারণা করিনি। তাই আমি শুধু বললাম—ওদের সঙ্গে আর কারো যাবার কথা শুনেছ? আমি আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়ি।

আমার কথা শুনে পাপিয়া হেসে দেয়। স্পষ্ট শুনতে পাই। বলে—কাকু তুমি এ খবরটাও রাখো? এ নাহ'লে আর পুলিশের লোক!

আমি বলি—সে তো হ'ল। কিন্তু কে ওদের সঙ্গে গেল তাতো বললে না।

পাপিয়ার কথা আবারও শোনা যায়—মৌ-র সৎমা। ওর বাবা আর একটা বিয়ে করে ফেলেছিলেন। তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো। অনেক কথা বলব।

আমি ফোন নামিয়ে রাখি। মনে মনে একটু হাসি। দিলুকে ডাক দেই। বেচারীর তন্দ্রামতো এসেছিল। এবার ওকে বলি—মাই ডিয়ার দিলু, তোমার বা আমার আর কোনও চিন্তা নেই। তোমার ঐ প্রাণ আর ঐ সংসার কিছুই যাবে না। কিছুই যায়নি এখনও। বাবা। হ্যাঁ বাবাই সব বাঁচিয়ে দিয়েছেন। বুঝলে?

দিলু আমার কথা বুঝতে পারে না। বলে—বাবা? দাদা তিনি আবার কে? কোথা থেকে এলেন?

আমি বলি—আরে বাবা! বাবার রহস্য উদ্ধার করা কি আর এতই সোজা? এখন বুঝবেনা, পরে সব জানবে। আমি লিখব।